নন্দ আর কৃষ্ণা

জগদীশ গুপ্ত

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মসৃণ—গণ্ডস্থলও তা-ই, অর্থাৎ ব্রণ-কলঙ্ক একটিও সেখানে নাই; মণীন্দ্র আরো লক্ষ্য করিলেন, আঙুল আর করতল দিব্য নরম—আঙুলের গিঁঠগুলি রূঢ় পৌরুষে পালোয়ানীভাবে প্রকট হইয়া নাই। ভুরুও ভালো, চোখও ভালো; কিন্তু ঐ দু'টি শোভার আধার যেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন—তাদের সমন্বয়ে একটা সৌকুমার্য্যের উদয় হয় নাই, এমন অনেক দেখা যায়; কিন্তু নন্দকিশোরের তা' হইয়াছে—ভুরু আর চোখ যেন ভাবোন্মেষের চিরস্থির আলিঙ্গনে আবদ্ধ আর একাকার হইয়া গভীর সুন্দর স্বচ্ছ একটি প্রেম-পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে; দেখিলেই মনে হয়, আর মনে ছাপ পড়ে যে, এ আপন হইয়া যাইতে বিলম্ব করে না; প্রীতির আদান-প্রদানে এ প্রশ্ন কি সন্দেহ কি কার্পণ্য করিতে জানে না। তার উপর, ইহাও দ্রষ্টব্য যে, নন্দকিশোরের ঠোঁট দু'খানিও রমণীসুলভ সরস আর লাবণ্যযুক্ত।

ঐ সব লক্ষ্য করিয়া মণীন্দ্র তাহার পছন্দ না করিয়া পারিলেন না; এবং পছন্দ আর নিযুক্ত করিবার পর; স্থান, অর্থাৎ গৃহশিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ, নির্জ্জন হইলে নন্দকিশোরকে প্রশ্ন করিয়া তিনি দু'একটি খবর জানিতে চাহিলেন। এই প্রথম অর্থোপার্জ্জনের শুভ পথে পদার্পণ করা ছাড়া নন্দকিশোরের নগণ্য জীবনে তত্স্বরূপ বৈচিত্র্যেরও সূত্রপাত হইল; কারণ মণীন্দ্রের প্রশ্ন শুনিয়া আর তাঁর রকম দেখিয়া এবং তাঁর প্রশ্নের জবাব দিবার সময় সে কেবলমাত্র বিস্মিতই হইল—প্রশ্নের হেতু, আর তাঁর ভঙ্গীর মর্ম্ম তখনকার

মতো তার অননুভূতিই রহিয়া গেল, যেমন থাকে ব্যাধি যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া প্রকট হইবার পূর্ব্বে ভিতরে তার সঞ্চারটি।

মণীন্দ্র প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি বিয়ে করেছ ?

উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করা লজ্জার বিষয় নহে—তবু নন্দকিশোর লজ্জায় লাল হইয়া রহিল ; অত্যন্ত মৃদুভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বিবাহ সে করিয়াছে।

—করেছ। বলিয়া নির্ণিমেষ চক্ষে মণীন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ধ্যান করিলেন—বোধ হয় স্ত্রী-পুরুষের নিত্য সম্বন্ধটি।

তারপর বলিলেন, তোমার বয়স কত ?

—তেইশ।

—ছেলেপিলে হয়েছে ?

—আজ্ঞে না।

–বউটি বুঝি ছোট ?

এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে নন্দকিশোরকে একটু থম্‌কিয়া ঢোক গিলিতে হইল ; মাথা নামাইয়া খুব সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দিল ; বলিল, না।

শুনিয়া মণীন্দ্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ র্নির্নিমেষ চক্ষে কি যেন ধ্যান করিলেন আরো গাঢ়ভাবে ; তারপর চক্ষু মুদ্রিত করিলেন যেন ধ্যেয় সামগ্রীটি তাঁর মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট আর অধিকতর উপভোগ্য হইয়া উদ্ঘাটিত হইয়াছে···

বলিলেন, বেশ। কিশোর আর কিশোরী। বলিয়া

এবার আর ধ্যান করিলেন না, চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া প্রসন্নবদনে একটু হাসিলেন।

নন্দকিশোর কিছুই বুঝিল না—কিন্তু উনি ঐ প্রশ্নগুলি করিলেন, এবং কোন্ রসের আবেশে তার চোখ বুজিয়া আসিল। নন্দকিশোর কেবল ধন্য আর কৃতজ্ঞ হইয়া রহিল—লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ লায়েক লায়েক উমেদারকে এক-কথায় বিদায় করিয়া দিয়া তাহাদের অভিলষিত পদে তাহাকেই নিযুক্ত করিয়াছেন যে! নন্দকিশোর পরম অনুগৃহীত হইয়া কেবল সুখানুভবই করিতে লাগিল—আর কিছু না। নন্দকিশোরের ইহাও মনে হইল যে, উঁহার কথায় বিস্মিত হওয়াই অন্যায় হইয়াছে।

—বেশ, পড়াও মন দিয়ে! বলিয়া মণীন্দ্র তাহাকে তার বাসস্থান দেখাইয়া দিয়া, ছেলে রাখালকে ঘনিষ্ঠভাবে তার সম্মুখে বসাইয়া দিয়া এবং কয়েকটি সদুপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

নন্দকিশোর কায়েমী হইয়া বসিল।

নন্দকিশোরের বাড়ীতে আছেন বিধবা মা, আর আছে ছোটভাই বিষ্টু, আর স্ত্রী মমতাময়ী। কিন্তু তাঁদের জন্য ভাবনা যে খুবই দুস্তর আর নৈরাশ্যজনক হইয়া আছে তা নয়; তবে পৈতৃক অর্থে হাত দেওয়া অনুচিত, এবং নগদ খরচের জন্য নগদ টাকার দরকার আছে; তা' ছাড়া আজকার দিনই

ত চরম দিন' নহে—অনন্ত প্রয়োজন আর সুখ দুঃখের দিন আছে সম্মুখে—তখন চোখে অন্ধকার দেখিয়া হাহাকার করিতে না হয় তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। অকেজো হইয়া বাহাত্তুরের মতো সে, সুস্থ, সবল, শিক্ষিত লোক, বসিয়াই বা থাকিবে কেন! মমতার সঙ্গে পরামর্শের ফলে এবং মায়ের সম্মতি লইয়া তাই সে মণীন্দ্রবাবুর ছেলেকে পড়াইতে আসিয়াছে।

ছেলেকে সে বাড়ীতে পড়ায়, সঙ্গে লইয়া বাহিরে বেড়ায়, মনের পক্ষে হিতকর আর বুদ্ধির পক্ষে পুষ্টিকর গল্প, উপদেশ শুনায়, আনন্দ আর উৎসাহ দেয়, এবং ঘরে নিজের আসল যে কাজ তা'-ই—ভালো একটা চাকরির সন্ধান করে···

এবং আরো কাজ সে করে—

পরম কৃতজ্ঞতাবশে সে ওঁদের সব আদেশই শিরোধার্য্য মনে করিয়া প্রাণপণে, আর, বাজারের ভিতর চক্ষুলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়াও তা' পালন করে। বাড়ীর চাকর বলরামও সেই সুযোগে নন্দ'র উপর মাঝে মাঝে একহাত কৌশল খাটায়—তাহার জবানি গৃহিণী আদেশ করিতেছেন বলিয়া নন্দকে দিয়া সে তাহারই কাজ করাইয়া লয়।

এদিকে স্বয়ং মণীন্দ্রবাবু আড়চোখে নন্দকিশোরের শিক্ষাদানের কৌশল, কথাবার্ত্তা, রুচি, সহবৎ, অভ্যাস প্রভৃতি খুব বিজ্ঞভাবে লক্ষ্য করিয়া অনিশ্চিন্ত হইয়া গেছেন···

ছেলেও পাঠগ্রহণে মনোযোগী হইয়াছে।

মণীন্দ্রবাবুর এই ছেলেটি তাঁর প্রথম পক্ষের। তাঁর প্রথমা স্ত্রী পরলোকগমন করিয়াছেন। এবং এক্ষণে জনশ্রুতি ইহাই যে, মণীন্দ্র সম্প্রতি অর্থাৎ বছর দেড়েক হইল, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন—সহরই তাঁর কর্ম্মস্থল বলিয়া তিনি, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বেই সহরেই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া সস্ত্রীক এবং সুখেই বাস করিতেছেন—দেশের তোয়াক্কা তিনি রাখেন না।

আবার রাস্তার লোকেও ইহা জানে যে, মণীন্দ্রবাবুর টাকার অভাব নাই—ন্যায্য কাজে হুঁশ আর মনে উদারতারও অভাব নাই। নন্দকিশোরের কাছে তাঁর হুঁশের আর উদারতার অকাট্য প্রমাণ ইহাই আসে যে, মাসিক আটটি টাকা বেতনের অংশ তিনি সর্ব্বদাই তাহাকে দিতে রাজি; বলেন, হাত খর্‌চর দরকার হলেই চেয়ে নেবে। বুঝ্‌লে? উপরন্তু "খাওয়াদাওয়া' করিতে দেন অন্তঃপুরেই। নন্দকিশোর ভর্ত্তি হই-বার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকেই অন্তঃপুরে লইবার অনুমতি অবশ্যই তিনি দেন নাই, কারণ অজ্ঞাতকুলশীলস্য ইত্যাদি হিতোপদেশটি তাঁর অজানা নয়; কিন্তু নন্দকিশোরের কুলশীল, অর্থাৎ প্রকৃত পরিচয় চারিত্রিক নির্ম্মলতা প্রভৃতি, বেশীদিন অজ্ঞাত রহিল না—নন্দকিশোর ঠাকুরের ডাকে তখন অন্তঃপুরে, রন্ধনালয়ে গিয়া আহার করিতে লাগিল! দিন তা'র সুখেই যায়।

মণীন্দ্রবাবুকে নন্দকিশোর ভালো করিয়াই দেখিয়াছে—তাঁর চেহারা তাঁর কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে; এবং এই একটা আক্ষেপ তাঁর আছে যে, মণীন্দ্রবাবুর গোঁফ যদি অত ছোট করিয়া না ছাঁটিতেন তবে চেহারাটা দেখিতে আরো ভালো হইত, খুলিত—নাকের নীচে আর উপরের ঠোঁটের উপর গোঁফগুলি প্রাণপণে খাড়া হইয়া থাকে—তা, অর্থাৎ খোঁচা মারার ভাবটা, না থাকিলেই যেন নিস্তেজ হওয়ায় নিখুঁত হইত—দর্শকের চোখে ব্যাঘাত জন্মাইত না।

মণীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে—এই গৃহের গৃহিণীকেও নন্দ দেখিয়াছে; খুব সুন্দরী তিনি; অন্তঃপুরে সাম্‌না-সাম্‌নি দেখে নাই, দেখিয়াছে অন্তঃপুরের বাহিরে—যখন তিনি স্বামীর সঙ্গে বাহির হন আর ফিরিয়া আসেন, অর্থাৎ তাঁর অতিশয় সুসজ্জিত অবস্থায়; কৃত্রিমতা, আর, তাঁরই একটা অভিনয়ের ভঙ্গীর ভিতর দূর হইতে তাঁহাকে নন্দ দেখিয়াছে।

খুবই সুন্দরী তিনি———

আধুনিকতম বেশ আর সপ্রতিভ গতিভঙ্গী এবং দুনিয়াকে নিতান্ত অবহেলা করিয়া তাঁর দৃষ্টিচালনা নন্দ দেখিয়াছে, আর, মনে মনে কত যে বিস্মিত হইয়াছে আর প্রশংসাও করিয়াছে তাহার লেখাজোখা নাই; কিন্তু ধন্য নন্দ!—মণীন্দ্রবাবুকে ঈর্ষ্যা করিবার কি তাঁর স্ত্রীর প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার মতো ইতর মন তার নয়, অত সাহসীও সে নয়; দৃশ্য হিসাবে আনন্দনীয় আর আনন্দপ্রদ, এ বিষয়ে এই মাত্র তার চেতনা, সজ্ঞান অনুভূতি।

ঐ সঙ্গে তার খুবই মনে পড়ে স্ত্রীর মমতার কথা—নাম তার মমতাময়ী এবং সত্যিই সে মমতাময়ী।

এঁর তুলনায় মমতার রূপ প্রণিধান যোগ্যই নয়, তর্কের অবসর না দিয়া তা' বলা চলে না; কিন্তু পার্থক্যও আকাশ পাতাল।··· নন্দ জানে রূপ ও প্রসাধন আর মার্জ্জন-সাপেক্ষ কৃত্রিম বস্তু নয়—দেহলগ্ন বাহিরের বস্তু তা' নয়। সে দেখিয়াছে ইঁহার বাহিরের রূপ; কিন্তু উদ্ভিন্ন উন্মুখ অন্তরের দ্যুতিতে দীপ্ত হইয়া প্রেমের যে রূপটি দেহে বিকশিত হয় তাঁর সে-রূপটি নন্দ দেখে নাই—কল্পনাও করে না—সে দুষ্ট বুদ্ধি তার নাই। ইঁহাকে যখনই সে দেখে তখনই দেখে ইহার রূপের অর্থাৎ রূপসজ্জার বিলাসবিভঙ্গ—এমন একটা চঞ্চল মূর্ত্তি যার স্বাদ নাই; কিন্তু মমতার রূপ প্রসাধনপটুতা আর বেশ রচনার দুরন্ত অন্তরাল হইতে উগ্র লীলায়িত হইয়া তার সম্মুখে নাই—

মমতাকে ভাবিতে যাইয়া সে ভেল্কি দেখে না; মমতা অতি সহজ, অতি সুবোধ্য, খুব স্বাভাবিক; আর তার মন অজানা আধারে লুক্কাইত নহে বলিয়াই তাহাকেই ভাবিতে নন্দ'র সব চাইতে ভালো লাগে—মনে হয়, এমন মধুর, এমন গভীর একাত্মতার অনুভূতি দেওয়া পৃথিবীর মধ্যে কেবল মমতার দ্বারাই সম্ভব।

নন্দকিশোরের আরো মনে হয়, ইনি হয়তো খুবই শিক্ষিতা, "কলেজ কেরিয়ার" হয়তো তারই সমান; হয়তো খুবই বাক্-পটু, খুবই প্রেমময়ী, খুবই আদরিণী ইত্যাদি; এবং ইহার

পদক্ষেপ যেমন ক্ষিপ্র, অর্থাৎ অশান্ত, মুখের কথাও হয়তো অত্যন্ত সুষ্ঠ ঋজুতম আকারে তেম্‌নি ক্ষিপ্রবেগে নির্গত হইতে হইতে থাকে···

ভাবিয়া নন্দর মনে হয়, ভারি জটিল; আর তার ভয় হয়—

কিন্তু তার অদৃষ্ট ভালো, মমতাব তা' নয়—মমতার মুখের কথা চমৎকার অস্পষ্ট, আর চমৎকার মৃদু; তার এই অস্পষ্টতা আর মৃদুতা এমন মুগ্ধকর যে, ভুলিতে পারা যায় না—ভাবিতে গেলে স্নেহে মন উদ্বেল হইয়া ওঠে। তবু সে রসিকা—নিজের ধরণে সে বেশ রসিকা—হাসায় সে খুব, ক্রিক্র যেন অজ্ঞাতসারে; তার চোখের চেহারা কি ঠোঁটের ভঙ্গী দেখিয়া অনুমান করিবার কিছুমাত্র উপায় থাকে না যে, সে মনে মনে তৈরী হইয়া আছে; কিন্তু সে কথার জবাব দেয় এমন স্থির-ভাবে, আর, হাসির কথার সঙ্গে তার শান্ত মুখের এমন অপূর্ব্ব অসামঞ্জস্য দেখা যায় যে, তাকে ভারি নিরীহ ভারি নির্দ্দোষ, আর, ভারি ভদ্র সরল মনে হয়।···চোখে তার আবেগ নাই, চঞ্চলতা নাই, বিলাস নাই, তীক্ষ্ণতা নাই, অথচ আলস্যও নাই, নির্বুদ্ধিতাও নাই—আছে কেবল কোমল একটা ভাষা, অসীম মাধুর্য্য আর নির্ভরতা, আর চোখের ভাবের সঙ্গে মুখের কথার অপূর্ব্ব মধুর অসঙ্গতি···

আর ভারি ভীরু সে—

স্বামীর আদর গ্রহণ করিতে করিতে সেও আদর করে,—দু'হাতে স্বামীর হাত জড়াইয়া ধরিয়া অধিকতর নিকটবর্ত্তী

হইতে হইতে—স্বামীর আঙ্গুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে হঠাৎ সে সারিয়া যায়।

নন্দ বলে, ও কি, অমন ক'রে ত্যাগ ক'রে গেলে যে!

মমতা বলে, তুমি যদি রাগ করো!

—রাগ ক'রবো কেন। এ সুখের কথা না রাগের কথা।

—যদি অন্যায় মনে করো!

মমতার মুখের এম্‌নি টুক্‌টাক্ কথাগুলি নন্দ'র ভারি মিষ্টি লাগে, আর তার ভারি হাসি পায়।

বলে, অন্যায়ের জ্ঞান তোমার কিছুই নেই।

মমতা তখন হাসিয়া বলে, বাঁচলাম।

কিন্তু তার আচরণ কেহ অন্যায় কিংবা তাহাকে কেহ প্রগল্‌ভ মনে করিবে এই ভয় সে সর্ব্বদা সত্যই সাবধান—স্বামীকে সঙ্গ আর আনন্দদানেও তার বাড়াবাড়ি কোথাও নাই।

তবু সে মাঝে মাঝে ইয়ারকি দেয়—বলে, অমন করে তাকিয়ে আছ যে? নন্দ বলে, একটু ইয়ারকি দেব ভাব্‌ছি।

—উঁ হুঁ ভয় পেয়েছ।

নন্দ বুঝিতে পারে না যে, তাহাকে ডিঙ্গাইয়া মমতাই ইয়ারকি শুরু করিয়াছে—

বলে, তার মানে?

—সেদিন রান্নাঘরে একটা বেরাল কেবলি ছোঁকছোঁক করছিল, 'হেই' বলে' ধমক দিতেই সেটা খানিক পিছিয়ে ঠিক

তোমার মতো করে তাকিয়ে থাক্‌ল।

নন্দর মুখে হাসি দেখা দেয়, বলে,—তারপর ?

—আবার 'হেই' করতেই দিল পিট্‌টান। 'আমি ত' তোমাকে কিছু বলিনি যে পালাবে !

নন্দ তখন হাসিয়া উল্লাসে আকুল হইয়া যায়—আগাইয়া গিয়া তাহাকে ধরে—দু'হাতের চাপের ভিতর তাহাকে জড়ো করিয়া লয়—চোখ বন্ধ করিয়া তার নিজের আর মমতার রক্তের উত্তপ্ত নাচন অনুভব করে।

মমতা চিঠি লেখে—

নন্দকিশোরও লেখে ; নন্দকিশোর চিঠিতে চুম্বন জানায় ; কিন্তু মমতা তা জানায় না। তৃষিত নন্দ মনে মনে খুঁৎখুঁৎ করিয়া একবার অপরিসীম তৃষ্ণা জ্ঞাপন করিয়া ঐ বস্তুটি ভিক্ষা চাহিয়া আর অনেক মিনতি ও কাতরোক্তি করিয়া এক পত্র ডাকে দিল—

"পুনশ্চ" দিয়া লিখিল, "চাই কিন্তু"

কিন্তু মমতা লিখিল : "যদি হঠাৎ কেউ চিঠি দেখে ফেলে তবে সে মনে করবে কি ! তোম্‌রা লিখতে পারো ; কিন্তু মেয়েরা কথাটা লিখ্‌লে কেমন যেন অন্যায় আর 'অভদ্দর' মনে হয়"।

ঐ অন্যায় আর 'অভদ্দর' শব্দটা পত্রে ব্যবহার না করার কারণ দেখাইয়া মমতা অনেক কথাই লিখিতে পারিত—

লিখিতে পারিত যে, হাতে কলমে সত্যিকার জিনিসই যখন চাওয়ামাত্র দিয়ে থাকি তখন পত্রের মারফৎ নিরবয়ব বস্তুর দরকার কি ? তার জন্যে অনর্থক এত লোলুপতা কেন ? এসে নিয়ে যাও, একবাব নয়, দু'বার নয়, অগুণতি, যত ইচ্ছে তত···

কিন্তু তা' সে লেখে নাই।

কয়েক সপ্তাহ পরে অনেক ইতস্ততঃ করিয়া নন্দ একদিন বাড়ী যাইবার অনুমতি চাহিল।

নন্দকিশোর বিবাহিত মণীন্দ্র তা জানেন—প্রথম দিনই প্রথম সাক্ষাতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া তা জানিয়া লইয়াছিলেন।

নন্দ বাড়ী যাইবার অনুমতি চাহিলেই তিনি আগে মুচকি হাসিলেন; তারপর নন্দর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন বাড়ী যাবে ? যাও, কিন্তু দু'রাত্রির বেশি নয়।

দিনের কথা না বলিয়া মণীন্দ্র বলিলেন রাত্রির কথা—কোন্ দিকে তিনি ইঙ্গিত করিলেন নন্দকিশোর তা পরিষ্কার বুঝিল একটু থতমত খাইয়া গেল।

তারপরই মণীন্দ্র বলিলেন। অত শীগ্‌গির চলে আস্‌তে মন চাইবে না ; না ? বৌটিকে এখানে নিয়ে এলেও ত পারো !

মনে হইতে পারে বধুটিকে এতদিনেও তাঁহার গৃহে আনয়ণ না করায় মণীন্দ্র মৃদু অনুযোগ করিলেন, এবং এই নিমন্ত্রণে এই অমায়িক ভদ্রলোকটির নিষ্পাপ হৃদ্যতা ব্যতীত ভিতরে আর কিছুই নাই।

নন্দকিশোর মনে করিল তা-ই এবং সুখী হইল; বলিল, মাকে একা থাকতে হয়, আর—

মণীন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন,—এদিকে তুমি যে একা থাকো! বয়স কত তোমার?

—তেইশ।

তেইশ। তেইশ বছর বয়সে বিয়ের পরও একা থাকা কত কষ্ট তা যারা থাকে তারাই জানে। তোমাকে আমি আটকাবো না, শাপ লাগবে। ... নিয়ে এসো—আনন্দে থাকা যাবে। বলিয়া মণীন্দ্র যেন জরুরী একটা তাগিদ্ই দিলেন।

তাঁর আনন্দ কিরূপ, কোথায় এবং কেন, অর্থাৎ গৃহ-শিক্ষকের আনন্দেই অনুকম্পাশীল অভিজ্ঞ ঐ ব্যক্তির আনন্দ কি না তাহা নন্দ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না—

কুণ্ঠিতভাবে বলিল, যাবো?

যাও; কিন্তু ...

—আজ্ঞে, পরশুই চলে' আস্‌ব'।

—ত্'রাত্রি পাবে?

নন্দ জবাব দিল না—

মণীন্দ্র বলিলেন, দিনে গাড়ী কখন্?

—তিন্‌টেয়।

—তা হলে দুপুরটাও পাচ্ছ। বলিয়া মণীন্দ্র সম্পর্ক বিগর্হিত এবং বয়সের তারতম্য হিসাবেও অত্যন্ত অনুচিত একটু ইঙ্গিতের হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন।

নন্দ এতক্ষণে টের পায়, একটা ইন্দ্রিয় লালসা যেন মণীন্দ্রের কথার, সুরে, মুখে চোখে সঞ্চিত হইয়া আছে!

ছুটি পাইয়া নন্দকিশোর বাড়ী আসিল।

মা বলিলেন, ভাল ছিলি?

—হ্যাঁ, মা যত্ন পাচ্ছি।

মমতা বলিল, আস্‌তে দিলে?

—হ্যাঁ।

—লোকটি ত ভালো!

হ্যাঁ, দয়া আছে। তেইশ বছরের যুবক স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাক্‌তে যে কষ্ট পায় তা তিনি জানেন। বলিয়া নন্দ হাসিল; বলিল, কষ্ট সত্যিই খুব ..

মমতা জানিতে চাহিল, তিনি যে জানেন তা তুমি জান্‌লে কেমন করে?

—বল্‌লেই স্পষ্ট; দরদ দেখালেন খুব। বললেন, বৌকে নিয়ে এস এখানে—তেইশ বছর বয়সে বৌ-ছাড়া হয়ে থাকা যে কত কষ্ট তা কেবল ভুক্তভোগীই জানে।

মমতা অবাক্ হইয়া বলিল, তোমার সঙ্গে ঐ সব কথা হয় নাকি?

—হ'ল এবার, মানে, তিনিই বল্‌লেন।

—বয়স কত তাঁর?

—প্রায় চল্লিশ। দ্বিতীয় পক্ষ।

—তা-ই নাকি! দ্বিতীয়াকে দেখেছ? —কেমন?

—খুব সুন্দরী।

মমতার মুখ হঠাৎ ভারি বিমর্ষ হইয়া উঠিল, ওখানকার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটি খুব সুন্দরী বলিয়া নয়, আর তিনি বৃদ্ধের ভার্য্যা এবং স্বামী অনাত্মীয় যুবক এবং সেই গৃহবাসী বলিয়াও নয়, অন্য কারণে; তার মনে হইল, ভদ্রসন্তান আর গৃহ-শিক্ষক হিসাবে একটি ব্যক্তির যে মর্য্যাদা অবশ্য প্রাপ্য সে মর্য্যাদা তার স্বামীকে দেওয়া হয় নাই, আর, ভদ্র ব্যক্তি এবং বয়সের পার্থক্য হিসাবে যে সংযম আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা মানুষের উচিত তাহা রক্ষিত হয় নাই—হয় নাই অতি জঘন্য কারণে; পরস্ত্রী সম্বন্ধে কুণ্ঠাহীন আলোচনায় রত হইয়া তিনি সেই শিষ্ট রীতি লঙ্ঘনপূর্ব্বক আত্মসম্মানের কথাটা বিস্মৃত হইয়াছেন—তিনি অগৌরবজনক নিলর্জ্জতা আর আত্মসংযমের অভাব দেখাইয়া অমার্জ্জনীয় অন্যায় করিয়াছেন···

বলিল, তুমি ওখানে আর থেকো না।

—কেন?

—ভদ্রলোক লোক ভালো নয়।

নন্দ তা' বুঝিয়াছে—

এবং শিশুপ্রকৃতি মমতাও তা বুঝিয়াছে দেখিয়া নন্দকিশোর ভারি বিস্মিত আর পুলকিত হইয়া গেল; বলিল, আমার অনিষ্ট তিনি কিছু করতে পারবেন না। তুমি যাবে সেখানে?

—দশ বছর তোমার দেখা না পেলেও নয়।

শুনিয়া নন্দকিশোর উৎসাহে আর প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া মমতাকে আরো ভালবাসিল।

একটা উৎকণ্ঠা লইয়াই নন্দকিশোর মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে তার কর্ম্মস্থলে, আজ ঠিক তুদিন বাদে, প্রবেশ করিল। মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হইবেই; এবং দেখা হইলে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া তাহার কাছে তিনি অনেক কথা জানিতে চাহিবেন কিনা, এবং ছুটি মঞ্জুর করিবার সময় তিনি যে সমুদয় কথা কথা বলিয়াছিলেন সেই কথার তন্তুমালা আরো প্রসারিত আর সূক্ষ্ম করিয়া লইয়া ঘটনার অন্বেষণ করিবেন কিনা এবং একটা টিপ্পনী কাটিবেন কি না কে জানে !...যদি করেন !

নন্দর একটু বিরক্তি বোধই হইল। কিন্তু নন্দ অস্বস্তি বোধ করিলে কি হইবে ! মণীন্দ্রের কথা স্থির হইয়া শ্রবণ করা এবং স্থিরভাবে তাঁর কথার জবাব দেওয়া তার অনিবার্য্য অদৃষ্ট। তার অনুমান সত্য হইল, অব্যর্থভাবে দেখা গেল, নন্দকিশোরের পারিবারিক অস্তিত্বকে মণীন্দ্র আদৌ ভুলিতে পারিতেছিল না— ভুলিতে পারিতেছেন না বলিলে সবটা বলা হয় না—আরো নিবিড়তা তিনি চান···

তুদিন বাদে নন্দকে পাইয়া তিনি পরম বিস্মিত হইয়া গেলেন—বিস্ময়ে চোখ বড়ো করিয়া বলিলেন,—কথা ঠিক রেখেছ দেখছি। তোমার দিব্যি, আমি ভেবেছিলাম, একটি দিন চুরি তুমি করবেই; তুমি না করো তোমাকে দিয়ে করাবে একজন···

কে তাহাকে আসিতে দিবে না, দিন চুরি করাইবে, তাহা নন্দ বুঝিল, এবং একটু হাসিল—হাসিয়া সে মাসিক আট টাকা

বেতনদাতা আর রোজ ’দুবেলাকার অন্নদাতার মান রাখিল, প্রায় অর্থহীনভাবে বলিল, আজ্ঞে না !

মণীন্দ্র জানাইলেন, তোমার এই বয়সে আমি এ বিষয়ে খুব হাভেতে হ্যাংলা ছিলাম— তারপর বলিলেন—কিন্তু বৌকে আনালে না যে ? বলিয়া পরক্ষণেই বলিলেন, —সখীর মতো দু’জনে থাক্‌ত’ ভালো। একা থাকে ত’ সর্ব্বদাই !

কথাটা সংস্কৃত, এরং মন্দ শুনাইল তা ; নন্দ তৎক্ষণাৎ মিথ্যা উক্তি সাজাইয়া তুলিল ; বলিল. মা বল্‌লেন’ বিষ্টুর পরীক্ষাটা হয়ে যাক্‌, তারপর না হয় যাবে।

তারপর মণীন্দ্র আনন্দ আহরণের বিষয়বস্তু পরিবর্ত্তন করিলেন—

—তোমার বোনের বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে ? বলিয়া তিনি পুনরায় ভারি লিপ্ত হইয়া উঠিলেন, নন্দর মেয়েলী ছাঁদের স্বচ্ছ মসৃণ সুগঠিত মুখের দিকে তিনি স্থির চক্ষের তাকাইয়া রহিলেন—কি তিনি কল্পনা করিতে লাগিলেন তাহা তিনিই জানেন ; বোধ হয় ইহাই যে, নন্দর ভগিনীর স্বাস্থ্য নিবিড়, যৌবন সমাগত, মন প্রফুল্ল, মুখ সহাস্য এবং রূপৈশ্বর্য্য অপরিসীম হওয়াই সম্ভব···

কিন্তু নন্দ তাঁহাকে হতাশ করিল ; বলিল, বোন্‌ আমার নেই।

নন্দকিশোরের বোনের ঝঞ্ঝাট নাই শুনিয়া মণীন্দ্র যেন সঙ্গে সঙ্গে বাঁচিয়া গেলেন ; বলিলেন, যাক্‌, বেঁচেছ । ···কিন্তু আর ছুটি শীগগির পাবে না বলে’ দিচ্ছি।

বলিয়া নন্দকিশোরকে তিনি শাসাইয়া রাখিলেন, এবং ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন; স্ত্রীর সঙ্গে তার দীর্ঘ বিচ্ছেদের ভয় দেখাইয়া তিনি যেন একটা দুর্ম্মূল্য আর পবিত্র কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

নন্দ কেবল বিস্মিত হইতেই পারগ—

মণীন্দ্রের এই অস্বভাবিকতার আত্ততায় সে বিস্মিত হইয়া বসিয়া রহিল—মণীন্দ্র চলিয়া গেলেন।

রাখালকে নন্দ খুব পড়ায়—কিন্তু মণীন্দ্রের মতো চৌকস পিতার পুত্র রাখাল জড়বুদ্ধি ছেলে—পাঠ্য বিষয় তার মস্তিস্কে যেন ঠেলিয়া ঠেলিয়া ঢুকাইতে হয়।

চাকর বলরাম আহ্লাদে গোছের—কথা বলিবার সময় দাঁত বাহির করিয়া কেবলই গা দোলায়, আর, ঠাকুর ইরে রাম গোবেচারী, যা বলো তাতেই সায় তাতেই রাজি।

ছেলে কেমন পড়ছে মাষ্টার?

জিজ্ঞাসা করিয়া ছেলের পড়িবার অর্থাৎ নন্দ'র থাকিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া মণীন্দ্র চেয়ারে উপবেশন করেন।

নন্দ বলে, বুঝতে কিছু দেরী হয়, কিন্তু আগ্রহ আছে।

মণীন্দ্রের নাকের নীচেটা, অর্থাৎ গোঁফ জোড়া নড়িয়া ওঠে—তিনি হাসেন আর বলেন, তোমারও কিন্তু বুঝ্‌তে দেরী হয়, আর আগ্রহও নেই।···তোমার কোনো অসুবিধা হ'চ্ছে না ত'

—আজ্ঞে, না।

—ঘরটাকে আর একটু সাজানো দরকার, ছেলেমানুষ তুমি, কিন্তু ধরণ তোমার বুড়োর। তোমার শখ কিছু নেই। তুমি জানো না বোধ হয়, বুড়ো মানুষ আমি একেবারেই পছন্দ করিনে—বুড়ো মানুষের দিকে চাইলেই আমার বুকে যেন ঠাণ্ডা লাগে—

মনিবের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে বিনয়ের অবতার নন্দকিশোর একটু হাস্য করিল।

মণীন্দ্র বলিলেন, হাস্‌লে তুমি—বোধ হয় ঠাণ্ডা লাগার কথায়। কিন্তু দেখ, আমার বাড়ীতে যারা আছে, তারা সবাই যুবক।

নন্দ তা স্বীকার করিল, আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—কেন বলো ত'? দেখি তোমার বুদ্ধি।

বুদ্ধির পরীক্ষায় নন্দ ফেল করিল—বলিল, তা' ত' জানিনে।

—জানো না। আর, সবাই বিবাহিত—লক্ষ্য করেছ? ঠাকুর, চাকর, আর অদৃষ্টক্রমে তুমিও। বিয়ে করে' দায়িত্ববোধ বেড়েছে বলে' কাজ ভালো পাব এ আমার উদ্দেশ্য নয়।

কি তাঁহার উদ্দেশ্য তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে—তিনি তা' প্রকাশ করিবেন এই আশায় শিষ্টাচারী নন্দ তাঁহার মনিবের দিকে চাহিয়া রহিল—

উদ্দেশ্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে উদ্দেশ্যকে জোরালো এবং

হৃদয়গ্রাহী করিবার উদ্দেশ্যে মণীন্দ্র একটু হাসিলেন—অকিঞ্চিৎকর হাসি নয়, খুব নিপুণ আর উচ্চস্তরের আত্মগরিমার হাসি—

হাসিয়া বলিলেন, ঘরে যুবতী স্ত্রী যার আছে সে সুখী নয় কি? সুখী। আমি তার সুখের অংশ গ্রহণ করি।

নন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কেমন করে'?

—মনে মনে ছাড়া আর কেমন করে'! একেবারে বালক। বলিয়া মণীন্দ্র এমন একটা ভঙ্গী করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন যেন নন্দর সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ পাওয়া যাইতেছে না।

কিন্তু তাঁর ঐ চাঞ্চল্য ক্ষণিকের—তারপরই তিনি যেন তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমার পর্দ্দা নিরাপদ। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নন্দকিশোর ভাবিয়া পাইল না, মনে মনে কেমন করিয়া অপরের সুখের অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়!

পরীক্ষায় রাখাল এই প্রথম সকল বিষয়ে পাশ করিয়া প্রমোশন পাইল—মণীন্দ্র কলরব করিয়া শিক্ষক নন্দকিশোরকে অভিনন্দিত করিলেন; বলিলেন—"সাবাস মাষ্টার"। তারপর হর্ষ সংবরণ করিতে না পারিয়া নন্দকিশোরের বেতন দু'টাকা বাড়াইয়া দশ টাকা করিয়া দিলেন। পটভূমিকা এই পর্য্যন্ত একেবারে দোষমুক্ত; কিন্তু মণীন্দ্রনাথ সত্যিকারের জাদুকর—রূপবদ্‌লাইয়া অন্য পটের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িতেও তাঁর বিলম্ব

হইল না এবং ছেলের সম্মতিসূচক অত্যন্ত শান্তিপ্রদ সুখাবহ নির্ম্মল ব্যাপারটাই তাঁর মানসিক তৎপরতা এবং একটা তৎপরায়ণতার ফলে হইল নন্দকিশোরের পক্ষে অন্যতম বিক্ষোভের কারণ।

বেতনবৃদ্ধি জ্ঞাপন আর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া মণীন্দ্র জানিতে চাহিলেন, খুশী ত' ?

নন্দ খুশী বই কি—বলিল, আজ্ঞে, হ্যাঁ।

কিন্তু মণীন্দ্র তখন একটা সুচিন্তিত অভিলাষবশত খুব খোশমেজাজে আছেন, বলিলেন, তুমি ত' খুশী এখানে ; ওখানে তোমার বউকেও আমি খুশী করতে চাই। তা'কে একখানা নীলাম্বরী কিনে দিও। দিও বুঝলে ? টাকাটা চেয়ে নিও।

মণীন্দ্রের এই ব্যাকুল আগ্রহ দেখিয়া অবাক্ নন্দ দ্বিগুণ অবাক হইয়া গেল—ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিতেও তার মন সরিল না —তার এই অবিচলতা অবাধ্য প্রতিবাদের মত দেখাইতেছে বুঝিয়াও সে অবিচলিতই রহিল।

তার স্ত্রী, মমতা, নীলাম্বরী পরিধান করিলে এই মানুষটির ইচ্ছার সার্থকতা কিসে ? নন্দর খুবই মনে হইল, লোকটি অদ্ভুত, এবং ইঁহার আচরণ যেন হৃদকম্পজনক—প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃ উদ্ভাসিত হইয়া যেন দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে। তার স্ত্রীর সম্বন্ধে ইঁহার মনোভাব আর যেন আবছা সন্দেহের বিষয় নহে—ইনি তাহাকে আকাঙ্ক্ষাই করেন। নন্দকিশোরের মনে হইল, মমতাকে সে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে, মণীন্দ্র তার

অনিষ্ট করিতে পারিবেন না ; কিন্তু তা' ভুল—এখানে থাকা সত্যই নিরাপদ নয়—কুসংসর্গে বুদ্ধি বিপথে চালিত এবং আত্মা অধোগামী হইবেই। নারীপ্রসঙ্গে মানুষের এমন নির্লজ্জ দুর্নিবার লোলুপতা কেমন করিয়া আসে আর প্রকাশ পায় তাহা সে কল্পনাই করিতে পারিল না—এমনই তা অভদ্র—

মণীন্দ্র জানেন না যে তিনি নীলাম্বরি উপঢৌকন দিয়া একটি নারীকে খুশী করিতে চাহিয়া তার স্বামীর মনে বিদ্রোহী উত্তাপের সঞ্চার করিয়াছেন—সে তাঁহাকে জঘন্য মনে করিতেছে—

তিনি তখনও নিজের আনন্দেই বিভোর—সেখানে বসিয়া মানসচক্ষে দেখিতেছেন, নীলাম্বরি পরিহিতা রমণী অভিসারে যাত্রা করিয়া জ্যোৎস্নালোকে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

কিন্তু নন্দকে শীঘ্রই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে হইল, মণীন্দ্রের এরূপ রসের উপদ্রবে নয়, অন্য কারণে।

মণীন্দ্র তাহাকে টাকা দেন, খাইতে দেন, আর দেন পীড়া। পীড়া সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, অভীষ্টসাধনের উপায় হিসাবে মণীন্দ্রকে মধ্যে রাখিয়া, আর, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ কার্য্যকর উৎসাহ দিয়া অদৃষ্ট যেন নন্দকিশোরের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করিতেছে···

পরীক্ষার ফল কি দাঁড়াইত এবং কবে দেখা দিত তা'

কেউ জানে না, কিন্তু সেদিকে ফল দাঁড়াইবার এবং দেখা দিবার পূর্ব্বেই অন্য দিকে যা' ঘটিল তাহাও ফলোৎপাদক—তাহারই ফলে প্রচণ্ড বেগযুক্ত একটা ধাক্কা খাইয়া নন্দকিশোর অচিরেই একদিন পলায়ন করিল।

একদিন বৈকালে নন্দকিশোর বলরামকে খুঁজিয়া পাইল না, সচরাচর সে কাছাকাছি কোথাও থাকে না, আজ এখনও নাই, ঠাকুর তার গ্রাম হইতে আগত এক ব্যক্তির কাছে বাড়ীর খবর জানিতে গেছে—তাহাকে বলিয়াই গেছে, এখনও সে ফেরে নাই। তৃতীয় ব্যক্তি রাখাল—কিন্তু তাহাকে তাহার জনৈক বন্ধু ডাকিয়া লইয়া কোথায় গেছে তারও ঠিক নাই—

বাবু আছেন "ওপরে"—

এদিকে টেলিগ্রাম পিওন আসিয়া টেলিগ্রাম লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তার সবুর সহিবার উপায় নাই—'আর, 'কাম শাপ' ছাড়া 'আর-কোন সংবাদই 'তারে' আসে না; সুতরাং নন্দ সিদ্ধান্ত করিল যে পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

'বাবু' বলিয়া চীৎকার করাও অসম্ভব—লজ্জা করে; অতএব এখন সাংঘাতিক জরুরী ব্যাপারে, উপরে গিয়া সংবাদ দিতে বা সাক্ষাৎ করিতে বাধাটা কি! বাবু তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না নিশ্চয়ই···

গবেষণাপূর্ব্বক, এবং কর্ত্তব্যপালনে মানুষের যে সাহস থাকা দরকার সেই সাহস তাহারও আছে ইহাই মনে করিয়া নন্দ, বাবু যে উর্দ্ধলোকে রহিয়াছে সেই উর্দ্ধ-লোকের অর্থাৎ

দ্বিতলের অভিমুখে রওনা হইল। তার লক্ষ্য বাবু, এবং হাতে টেলিগ্রামের লেফাফা আর রসিদের কাগজখণ্ড ··

সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় নিষ্পাপ মন, দুরভিসন্ধির অভাব এবং কর্ত্তব্য পালনের সৎসাহস সত্ত্বেও তার বুক একটু একটু কাঁপিতে লাগিল: যেন অদৃষ্টের উপর শুভাশুভের ভার দিয়া অপরিচিত আর সঙ্কটসঙ্কুল স্থানে সে চলিয়াছে— এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া সে সিঁড়ি ভাঙ্গিতেছে ক্রূর নিয়তির বশে যেমন খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাং গিয়া লাফাইয়া পড়ে সাপের একেবারে মুখে।

মমতা শুনিলে স্বামীর ভীরুতায় হাসিবে নিশ্চয়ই; কিন্তু পরের অন্তঃপুরে প্রবেশ উদ্যম নন্দর পক্ষে এমনিই ভয়ঙ্কর।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সম্মুখেই প্রশস্ত চৌকোণ বারান্দা —দু'দিকে, বাঁয়ে এবং সম্মুখে প্যাসেজ— প্রত্যেক ঘরে প্রবেশের দরজা ঐ প্যাসেজে···কিন্তু নন্দ দেখিল, সবগুলি ঘরের দরজা বন্ধ। মাত্র একটি ঘরের দরজা খোলা আছে বলিয়া তার মনে হইল; সম্মুখের প্যাসেজ দিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেলে দক্ষিণে সেই দরজা পাওয়া যাইবে, এবং ঘরের অভ্যন্তরটা দেখা যাইবে—

কিন্তু ঐ ঘরেই বাবু আছেন কিনা কে জানে। পরক্ষণেই তার ত্রাস জন্মিল, গৃহিণী যদি হঠাৎ বাহির হইয়া তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া ওঠেন! তখন চক্ষের পলক না ফেলিতেই অবস্থাটা কি দাঁড়াইবে! মানুষের সে অবস্থা ভাবিতেই পারা যায় না।

অপরাধ হাল্‌কা করিয়া আনিতে নন্দ ডাকিল, বাবু ?

মণীন্দ্রকে নন্দ কোন সম্পর্ক ধরিয়া কি কিছু বলিয়াই ডাকে না—ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বাবু বলিয়া ডাকিল ; কিন্তু আহ্বান তার ভয়ে সঙ্কোচে এত ক্ষীণ যে, আহ্বানে ফলোদয় হইল না—বাবুর সাড়া আসিল না—

কিন্তু আসিল মধুর একটি গন্ধ, দামী সাবানের উৎকৃষ্ট ঘ্রাণ—

টেলিগ্রাম-পিওন কঠোরস্বরে বলিয়া দিয়াছে, বাবু, জল্‌দি কর্‌না—

নন্দ আরও দু'পা অগ্রসর হইয়া গেল—অনুমান করিল, সাবানের ঘ্রাণ আসিতেছে ঐ খোলা দরজা দিয়া—বাবু ঐ ঘরে বসিয়াই অভিজাত সাবান-সহযোগে বৈকালিক ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিতেছেন্…

তারপর সে আরো বুক বাঁধিল ইহাই মনে করিল যে, যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ গৃহিণীর সম্মুখে সে পড়িয়া যায় তবে সে কাতর স্বরে বলিবে, "ঠাক্‌রুণ, এই টেলিগ্রাম এসেছে—অত্যন্ত জরুরী বলেই আমি নিয়ে এসেছি—নীচে আর কেউ নেই ! আমাকে ক্ষমা করুন"।

স্বয়ং বাবুর হাতেই টেলিগ্রাম পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে প্রায় নিঃসন্দেহ হইয়া নন্দ খোলা দরজা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল এবং দরজার সম্মুখে পৌঁছিয়াই পরমুহূর্ত্তেই হাতের কাগজ ফেলিয়া দিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল…হুঁশ রহিল না, এখন সে কোথায়, চারিদিকে আলো না অন্ধকার, সিঁড়িতে পা

দিয়া, না গড়াইয়া সে নামিতেছে, আর কোথায় সে চলিয়াছে—

এক মুহূর্ত্তে এলগর্ভ এতবড় দৈবযোগ ইতিহাসে আর ঘটে নাই!

কিন্তু আসিল সে ঠিক পথেই, পৌঁছিল সে নিজের ঘরেই, এবং ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল নিজের চেয়ারটিতেই—

তখন ঘামে তার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেছে—মাথার ভিতর কেমন করিতেছে—সেই কেমন করাটা অসাড়তা না যন্ত্রণা না ঘূর্ণণ তাহা উপলব্ধি হইতেছে না; এবং মস্তিষ্কের সেই অবর্ণনীয় অবস্থার দরুণ তার চিন্তাশক্তি, এবং নিজেকে হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্বিৎ লোপ পাইয়া গেছে—

টেলিগ্রাম-পিওনের প্রশ্ন তার কানে গেল না!

তারপর জন্মিল দুঃসহ প্রবল ত্রাস—

মা'র খাইয়া বিদায় লইতে হইবে—মারিবে জুতা না বেত!

নন্দর চক্ষু দেওয়ালের দিকে নিষ্পলক হইয়া রহিল—ক্রোধে আগুন হইয়া শাস্তিদাতার ক্ষিপ্ত ক্ষিপ্র অবতরণের বিলম্ব আর কত?

যাহা দেখিবার নয় নন্দকিশোর দৈবাৎ তাহাই দেখিয়াছে সন্দেহ নাই; মূঢ়তার বশে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সে করিয়াছে; অসাধুতার নয়, মূঢ়তার শাস্তি তাহাকে পাইতেই হইবে।

বাবু ঐ ঘরেই আছেন, কেবল উৎকৃষ্ট সাবানের গন্ধ পাইয়া

তাহা অনুমান করা বুদ্ধির চূড়ান্ত জড়তা, অথচ যে-নিয়তির বশে খাদ্যান্বেষণে নির্গত ব্যাঙ লাফাইতে লাফাইতে গিয়া পড়ে সাপের একেবারে মুখে সেই নিয়তির ক্রীড়া ছাড়া আর কি!

সে জানিত না যে—

কিন্তু অপরাধ চিরকালই অপরাধ, আর না জানিয়া অপরাধ করিলে সর্ব্বদাই তার ক্ষমা আছে, এবং ফলভোগ করিতে হয় না, এমনও নয়, যথা, আগুনে আঙুল পড়িলে আঙুল পুড়িবেই—আগুনে আঙ্গুল দৈবাৎই পড়ুক, কি জানিয়া-শুনিয়াই দাও। বিধি-লঙ্ঘনের মতোই নিজের মনের নিষেধ লঙ্ঘনেও ঝুঁকি যথেষ্ট—

ছি ছি—

নিন্দা লজ্জা ঘৃণা ধিক্কার ইত্যাদি ঐ শব্দ দুটি নন্দকিশোর, আতঙ্কে অভিভূত হইয়াও, পুনঃপুন আবৃত্তি করিতে লাগিল—

সর্ব্বনেশে সেই টেলিগ্রামকে মনে হইয়াছিল দুঃসংবাদের বাহক—কারো শেষ মুহূর্ত্তের ডাক, সে-ই করিল এই সর্ব্বনাশ! আর, আরো মাটি করিয়াছে সাবানের সেই গন্ধ। সাবানের গন্ধের অনুসরণ করিয়াই ত সে দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল—মনে করিয়াছিল, বাবু খেউরি করিতেছেন, কিন্তু দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল অন্য লোক—"একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার।"

প্রভুপত্নী তরুণী রমণী, মাত্র একখানি তোয়ালে কটিতট হইতে বিলম্বিত করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—দীর্ঘ কেশদামে

পৃষ্ঠদেশ আবৃত—ধৌত চুলে চিরুণী লাগাইয়া তিনি হাত তুলিয়া চিরুণী টানিয়া আনিতেছেন পিছনের চুলের ভিতর —দাঁড়াইয়া আছেন দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া, এবং সুবৃহৎ দর্পণের পটভূমিকায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

এক-পলকে নন্দ তাহা দেখিল না দেখা অসম্ভব, নন্দ আরো দেখিল যে, তাহারও প্রতিবিম্ব পড়িল সেই সাফ দর্পণেই, প্রভু-পত্নীর বহু পশ্চাতে।

আর সে দাঁড়ায় নাই, আর কিছু সে দেখে নাই, তারপর সেখানে কিছু ঘটিল কি না তাহা সে জানে না, কিন্তু পরিণামে কি ঘটিতে পারে, অর্থাৎ ফলভোগ কিরূপ হইবে তাহা সে জানে হৃদ্‌পিণ্ডে তাহা অনুভূত হইতেছে।

সে পলাইবে নাকি! থাক্ বাক্স-বিছানা বেতন—মানরক্ষা সর্ব্বাগ্রে!

কিন্তু মানরক্ষার্থে পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ মিনিট পাঁচ-ছয় পরেই, যাহার সম্মুখ হইতে পলায়নের কথা ভাবিতেছিল সেই মণীন্দ্রেরই পদশব্দ আসিল সিঁড়ি হইতে—অপমানিত প্রভু মৃত্যু-বিভীষিকার রূপ ধারণ করিয়া অনিবার্য্য রুদ্রমূর্ত্তিতে অবতরণ করিতেছেন।

নন্দর মনে হইল, তিনি যেন চীৎকার করিতেছেন, কই সে ব্যাটা?

নন্দ ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কোণের দিকে সরিয়া

গেল, তখনই সরিয়া আসিল বৃহদাকার টেলিগ্রাম-পিওনের পশ্চাতে।

মণীন্দ্র আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন, চৌকাঠ পার হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, আর, নন্দকিশোরের কম্পমান্ প্রাণ কণ্ঠে উঠিয়া আরো বেগে কাঁপিতে লাগিল।

ক্রোধে যে ব্যক্তি একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায় সে-ই হয় আরো ক্ষমাহীন।

কিন্তু "কই সে ব্যাটা ?" বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া মণীন্দ্র তাহাকে খুঁজিলেন না, সহজ লোক যেমন সহজ ভাবে কথা কয় তেমনি সহজভাবে তিনি বলিলেন, এই নাও। একটু দেরী হ'ল। বলিয়া তিনি পিওনের হাতে রসিদ দিলেন।

পিওন চলিয়া গেল —

তৎক্ষণাৎ দেখা দিল চরম সঙ্কট—নন্দর কণ্ঠাগত প্রাণ বোঁ করিয়া ওষ্ঠাগত হইল ; তাহার আর তাঁর মাঝখানে অন্তরাল আর নাই—বৃহৎ শরীর লইয়া সে প্রভুর চোখের উপর দাঁড়াইয়া আছে !

আড়ষ্ট নন্দ কষ্টে একটা ঢোক্ গিলিল।

যে-মেঘ দেখিয়া লোকে ঝঞ্ঝাসহ বজ্রশিলা আর বারিপাতের প্রতীক্ষা করে সে-মেঘে তা কিছুই ঘটে না এমন ঢের দেখা গেছে—তেমনি ঘটিল এখানেও, দুর্য্যোগ আসিল না। মণীন্দ্র তাহাকে দেখিয়াই কলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আরে, তুমি ছিলে কোথায় ? টেলিগ্রাম বুঝি তুমি দিয়ে এসেছ ওপরে !

স্বীকার করিলে গিয়া নন্দকিশোরের শুষ্ক কণ্ঠ এবং শুষ্ক

জিহ্বা আরো আড়ষ্ট হইয়া গেল—ঠোঁটের ফাঁক দিয়া শব্দের স্থানে খানিক বায়ু বাহির হইল কেবল।

মণীন্দ্র বলিলেন, রাখাল কি বলরাম ছিল না এখানে ?

নন্দ আগে দিল একটু গলা খাঁকারি উহাতে বাক্‌শক্তি সামান্য কার্য্যকর হইলে সে উচ্চারণ করিল, আজ্ঞে না—

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে হিল্-উঁচু জুতার খট্‌খট্ দ্রুত শব্দ উঠিল—গৃহিণী আসিতেছেন। নন্দকিশোর আর কিছু বলিতে চেষ্টা করিল না—করিলে সে দেখিতে পাইত, তার বাক্‌শক্তি পুনরায় লুপ্ত হইয়া গেছে; কারণ, গৃহিণী আসিতেছেন; তাহার সম্মুখেই তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ স্বামীর কাছে করিবেন এবং প্রতিকার চাহিবেন এমন দৃপ্ত তেজে আর এমন ক্রুদ্ধ হইয়া যে তখন···

কিন্তু কিছুই ঘটিল না—তিনি তা' করিলেন না—স্বামীর জন্য তিনি দাঁড়াইলেন না পর্য্যন্ত—একাই অগ্রসর হইয়া গেলেন রোজ যেমন যান; মণীন্দ্র তাঁর অনুগমন করিলেন, বলিয়া গেলেন, তুমি বুঝি বেড়াও না, মাষ্টার? বেড়িও, নইলে ও চেহারা থাকবে না।

নন্দকিশোর তখন মুহূর্ত্ত দুই নিশ্চেষ্ট অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সরিয়া যাইয়া চেয়ারে বসিল—একেবারে গা ছাড়িয়া দিয়া অবিলম্বেই একটা নিঃশ্বাস মুক্ত করিয়া দিল এবং সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার জ্বালা যন্ত্রণা উৎকণ্ঠা আতঙ্ক প্রভৃতি অশুভজনিত সমুদয় গ্লানি বহিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, ওঝার ফুঁ-এ বিষের মতো···তারপর ক্রমে সে খুশী হইয়া উঠিল: এমনি

ক্ষমাই ত মানুষকে করা উচিত, অজ্ঞানত দৈবাৎ যে অপরাধ ঘটিয়া যায় যথার্থ ভদ্রলোক নিজেরই মনে তার উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করে—বাহিরের শাস্তি কখনো অতিরিক্ত, কখনো অত্যাচার।

যে ব্যাপার সংক্ষোভে তুমুল এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতি-জনক হইয়া উঠিতে পারিত তাহা ক্ষমাময় উদার নির্লিপ্ততার ভিতর দিয়া নিঃশব্দে শেষ হইয়া গেছে। অন্য দিক দিয়া তাহার আর গুরুত্ব রহিল না—কেবল রহিল নিষ্কৃতিদানের দরুণ ওঁদের প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা আর, অতুল একটা আনন্দ···

পরদিন দ্বিপ্রহরে মণীন্দ্র আহারান্তে তাঁর কাজে বাহির হইয়া গেলেন। আজকাল তাঁহাকে কাজে একটু বেশি ব্যস্তই দেখা যাইতেছে।

নন্দকিশোর রান্নাঘরের দুয়ারের দিকে মুখ করিয়া আর একটা দেয়াল ঘেসিয়া খাইতে বসিয়া গেছে—

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া ঠাকুর কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ডালটা কেমন হয়েছে, বাবু?

ভালো না হইলেও নন্দ ভালোই বলিত, বলিল—ভালো হয়েছে।

—ঝোল্‌টা?

—ঝোল্‌টাও ভালো হয়েছে।

ঠাকুরের ইচ্ছা, মাহিনা বাড়াইবার প্রস্তাবটা মনিবের কাছে আজকালই করে, একটু দুঃখিতভাবেই বলিল, কিন্তু বাবু ত' কিছু বল্‌লেন না।

মণীন্দ্র রোজ তারিফ বা নিন্দা করেন।

নন্দ তাহাকে সান্তনা দিল, বলিল,-ভুলে গেছেন হয়তো···

বলিয়াই নন্দ অনুভব করিল, ঘরের ভিতর একটা ছায়া পড়িল. ছায়া ভৌতিক নয়, মনুষ্যদেহের, কারণ, পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর শুনা গেল : ঠাকুর, বলরাম কোথায় ?

শুনিয়াই বুঝা গেল, কণ্ঠস্বর নারীর—এবং তা' শুনিয়াই নন্দকিশোর অধোমুখ, শশব্যস্ত, ত্রস্ত এবং মনে মনে পলায়নোদ্যত হইয়া উঠিল—মুখে ভাতের গ্রাস তোলার চাঞ্চল্য বন্ধ হইয়া গেল, এবং দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন গৃহিণী···

ঠাকুর বলিল, তাকে আমি একটু বাজারে পাঠিয়েছি, মা, এক পয়সার পান আনতে।

ঠাকুর বড্ড পান খায়, এবং একটি করিয়া পয়সা সে রোজ পান-খরচা পায়।

কিন্তু গৃহিণী তখন মাষ্টারবাবুকে লক্ষ্য করিতেছেন—লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই ঠাকুরকে বলিলেন, ঠাকুর, এ-বাবুকে গাদার মাছ দিয়েছ যে ?

ঠাকুর হাত কচলাইতে লাগিল—

গৃহিণী ঠাকুরকে আদেশ করিলেন, পেটির মাছ দেবে। ···খান্ আপনি, খাওয়া বন্ধ কর্‌লেন কেন ?

ঠাকুরকে যেমন তাহাকেও তেমনি আদেশই তিনি করিলেন, নন্দকিশোরের মনে হইল, আদেশ মান্য করিতে সে বাধ্য, লজ্জায় চোখ-মুখ লাল করিয়া আর ছোট ছোট গ্রাস ধীরে ধীরে মুখে পুরিয়া নন্দ তাঁর আদেশ মান্য করিতে লাগিল…

গৃহিণী পুনরায় আদেশ করিলেন, ঠাকুর দু' পয়সার মিছ্‌রি নিয়ে এস ত' শীগগির। যে মিছরির ওপর মাছি বসে আছে দেখবে তা খবদ্দার এন না। যাও। আমি এঁর খাওয়ার কাছে দাঁড়াচ্ছি।

নন্দকিশোরের মনে হইল, গৃহকর্ত্রীর আদেশ করিবার ক্ষমতা অস্বস্তিকর হইলেও তাঁর এ আচরণটি খুবই অনুকম্পাময়, খুবই শিষ্ট, খুবই দায়িত্ববোধের পরিচায়ক!

ঠাকুর পয়সা লইয়া মিছরি আনিতে গেল—

এবং একা পড়িয়াই নন্দকিশোরের বুক আবার বেজায় ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল—গৃহকর্ত্রীর অনুকম্পা, শিষ্টতা এবং দায়িত্ব-বোধ যতই স্নিগ্ধ আর শান্তিদায়ক হউক, স্নিগ্ধতা আর সেই আবহাওয়া টিকিতে পারিল না—অপরাধের স্মৃতি সজীব আর কর্ত্রীর উপস্থিতি সেই মুহূর্তেই নিদারুণ উদ্বেগজনক হইয়া উঠিল—

সে এতক্ষণে যেন তার একটা ভুল বুঝিতে পারিল: নিজেরই হাতে যথেচ্ছ আর অবিসম্বাদিত শাসনক্ষমতা থাকিতে ইনি ঘটনার যথাযথ এবং আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা দিয়া স্বামীর কাছে অকারণে লজ্জা পাইতে যাইবেন কেন! পাপীকে দণ্ড দিবার হক্ তাঁর আছে—তা'ই দিতে তিনি আসিয়াছেন—

কিন্তু সব তার আগাগোড়া ভুয়ো ভুল, আর ভুসোর মত কালো আর হালকা। নন্দ যাঁহাকে চণ্ডিকা, শাসনকর্ত্রী, আর দণ্ডদাত্রী মনে করিয়া ভয়ে লজ্জায় ক্ষোভে এতটুকু হইয়া গেছে আর অনর্গল ঘামিতেছে, তিনি তখন তার অবনত মুখের দিকে তরল চক্ষে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

হাসিটুকু নন্দ দেখিতে পাইল না, কিন্তু স্বর শুনিল—দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্রী বলিলেন, কাল হঠাৎ এমন করে এসে দাঁড়ানো আপনার উচিত হয় নি।

খুঁজিলে ভৎর্সনার হুল ঐ কথার ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

ক্ষমা-ভিক্ষার সুযোগ পাইয়া নন্দর কথা ফুটিল, নিজেকে যেন সেখানে লুটাইয়া দিয়া বলিল—আজ্ঞে, সেজন্যে আমি অপরাধী আর অনুতপ্ত। আমাকে ক্ষমা করুন।

প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াও নন্দ তীব্রতম তিরস্কারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, আর তার তখনকার কাতরতাকে অবিশ্বাস কেহ করিতে পারিবে না।

অপরাধী আর অনুতপ্ত নন্দকিশোরের কাতর ক্ষমাপ্রার্থনা বিফলে গেল ক্ষমা করিতে তিনি রাজী কি নারাজ তা তিনি জানাইলেন না, বলিলেন, আমি তখন কেবল গা ধুয়ে এসে দাঁড়িয়েছি, হঠাং আয়নার ভেতর আপনাকে দেখলাম, আপনার ছায়া পড়ল।

নন্দ তা জানে, মর্ম্মান্তিকভাবেই জানে।

উনি বলিলেন, কিন্তু অমন করে ছুটে পালিয়ে গেলেন ভয়ে, লজ্জায় না ঘৃণায় ?

এ প্রশ্নের উত্তর কি থাকিতে পারে ! নন্দ কথা কহিল না—উঠিবার উপক্রম করিল।

—ভয় পাবার কি ছিল! ঘৃণাই বা করবেন কেন ! দোষ ত আপনারই। লজ্জা পেয়েছিলেন বুঝি ? ও কি ! খাওয়া শেষ না হতেই উঠছেন যে ? আমি তবে যাই এখান থেকে।

বলিয়া তিনি গেলেন না—বোধহয় যে মিছরিতে মাছি বসে নাই সেই মিছ্‌রি না লইয়া তিনি যাইবেন না।

নন্দ উঠিল না, অবসন্ন হস্তে ভাত তুলিয়া মুখে দিতে লাগিল।

—আপনার বিয়ে হয়েছে ?

নন্দ ধীরে ধীরে মাথা কাত করিয়া জানাইল, তার বিবাহ হইয়াছে।

—তবে ত বোঝেনই সব। কিন্তু আর কখনও যদি ওপরে আসেন তবে খবর দিয়ে আসবেন।

উপরে আসিতে তিনি নিষেধ করিলেন না। খবর দিবার লোক যখন থাকে না তখন টেলিগ্রাম আসিলে কি করিতে হইবে তাহাও তিনি বলিলেন না।

খবর দিতে অতিশয় সম্মত এবং তৎসহ ধন্য হইয়া নন্দ বলিল, আজ্ঞে।

—তা-ই করবেন্। আর একটা কাজ করবেন, আমার হুকুম—

বলিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন—

আদেশ গ্রহণ করিতে মনে মনে মাথা পাতিয়া নন্দ নিজের অজ্ঞাতেই যেন হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। সম্মুখবর্ত্তিনীর মুখের উপর তার দৃষ্টি পড়িল-তাঁহাকে না দেখিয়া সে পারিল না—দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাইবার পূর্ব্বেই যে একটিমাত্র চকিত মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইল সেই একটি মুহূর্ত্তেই তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডল তার দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত হইল—পরিহার করা গেল না; সে দেখিল, এবং তার হৃদয়ঙ্গম হইল যে, রূপ অজস্র—এত যে, আর, এমনি বিভ্রম ঘটানো তার শ্রী উজ্জ্বলতা যে, দৃষ্টি রূপ দেখিতে দেখিতে রূপ দেখিতে ভুলিয়া গিয়া রূপের দিকেই নির্নিমেষ হইয়া থাকিতে চায়······

তবু সে তাড়াতাড়ি চোখ নামাইল—কর্ত্রী বলিলেন,—আমার হুকুম মান্‌বেন ত' ?

নিতান্ত বশংবদ নন্দ যেমন করিয়া বিবাহের কথা স্বীকার কবিয়াছিল, ভয়ে ভয়ে মাথা কাত করিয়া হুকুম মানিতেও সে তেমনি রাজী হইল—কিন্তু সেটা যে এমন হাসির কথা হইবে তা' কি জানিত! কর্ত্রী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তাহাতে মধুবৃষ্টি কতটা হইল এবং মুক্তা ঝরিল কি না তা' নন্দ জানে না, সে কেবল কর্ত্রীর কাছে নির্ব্বোধ বনিয়া অপ্রস্তুত হইল······

তারপর, যে আদেশ মান্য করিতে নন্দ মাথা কাত করিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে সেই আদেশ বাক্য তিনি উচ্চারণ করিলেন বলিলেন,—পালাবেন না; আমাকে আয়নায় যেমন দেখেছে,

তেম্‌নি দেখা আমার ভালো লাগে—আপনাকে আরো… আপনি নির্ব্বোধ, তা'-ই দিশে পান না—পালান্‌।

বলিয়া তিনি থামিলেন—

পলায়নের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইল। নন্দ সাষ্টাঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াও সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল যে, তিনি দুই চক্ষুর দৃষ্টির দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর, অল্প অল্প হাসিতেছেন……

পরক্ষণেই তার কাপড়ের খস্‌খস্‌ শব্দ উঠিল—তিনি প্রস্থান করিলেন—যে মিছরিতে মাছি বসে নাই সেই জরুরী মিছরির কথা তিনি বোধ হয় তখন ভুলিয়াই গেছেন।

তারপর নন্দ কি করিল, কেমন করিয়া করিল; উঠিল না বসিয়াই রহিল; খাওয়া শেষ করিল কি না কোথা দিয়া সময় যাইতেছে; কেমন করিয়া আর কোন্‌ পাশে আসিয়া সে তার তক্তাপোষে আছড়াইয়া পড়িল তাহা, সে জানে না…

সর্ব্বপ্রকার উপসর্গের অতীত একটা তুরীয় অবস্থায় কিছুক্ষণ বেহুঁশ অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিবার পর সময়ের শুশ্রূষায় ক্রমে তার চোখে দৃষ্টি, বুকে নিঃশ্বাস, মস্তিষ্কে চিন্তার চৈতন্য এবং হাত পা নাড়িবার সামর্থ্য ফিরিল—তখনই সে উঠিল যেন বহুদিন পরে রোগশয্যা ছাড়িয়া নন্দ উঠিয়া বসিল—

বলিল, পালাই।—আরো কাছে সে বলিল না, মনের কথাটা মুখে ফুটিল। চামড়ার ব্যাগটি লইয়া নন্দ বাড়ীর

বাহির হইয়া গেল ; বাক্স বিছানা আর একুশ দিনের বেতন লইয়া সে চলিয়া আসিল—

মাকে বলিল, তাড়িয়ে দিলে। বলিয়া প্রণাম করিল।

মমতাকে বলিল, পালিয়ে এলাম। বলিয়া গভীর আগ্রহে তার মুখচুম্বন করিল।

পুত্রের পথশ্রম দূর হইলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাড়িয়ে দিলে কেন ?

নন্দকিশোর এদিকে সাদাসিদে আর সাধু যতই হউক ওদিকে মিথ্যা কথা বলিতে সে রাজী আছে ; বলিল,—আমার বিদ্যে অল্প ; বেশী বিদ্যের লোক পেয়ে গেছে বোধ হয়।

—তা'তেই তুই সর্ব্বস্ব ফেলে রেখে চলে এলি ?

নন্দকিশোর বলিল, কতবড়ো অবিশ্বাসের কাজটা করলেন তিনি তা' বুঝতে পারছ না ? রাগ হয় না ? একটু মেজাজই দেখিয়েছি, মা। বলিয়া নন্দ হাসিল।

—কিন্তু তাঁর ত' তলে তলে কাজ হাসিল করার কারণ দেখিনে !

—কি জানি ! তাঁর প্রকৃতিই ঐ রকম ; সাধারণ কথাই তিনি স্পষ্ট করে' বলেন না।

—জিনিসগুলো পাবি ত' ?

—পাবো, মা। কিছু ভেবো না।

মমতার সঙ্গে আবার দেখা হতেই মমতা বলিল, পালিয়ে ত' এলে। কিন্তু তল্পিতল্পা ফেলে' কেন ?

—তুমিই ত' চলে' আস্‌তে বলেছিলে !

—কিন্তু, বলিয়া মমতা থামিয়া গেল; তারপর বলিল, জিনিসগুলো নিয়ে আসার সময় হ'ল না, এ কেমন চলে' আসা। তোমার রাগ এত তা' ত' জান্‌তাম না। গুরুতর কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই।

—ঐ যে বল্‌লাম, একটু মেজাজই তাঁকে দেখিয়েছি। তাঁর রোখ দেখে দেরী করতে সাহস হ'ল না।

—তা' হবে। বলিয়া মমতা তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খানিকটা সময় নন্দর ভাবনার ভিতর দিয়াই কাটিল: মা এবং মমতা তার এই চলিয়া আসাটা যেন সম্পূর্ণ পছন্দ করেন নাই। জেরা করিয়াছেন খুব। কিন্তু মায়ের আর স্ত্রীর জেরা যদি অবুঝও হয় তবু, মানুষকে উদাস কি আন্‌মনা করে না—নন্দকিশোরকেও করিল না। যা' মানুষকে উদাস আর আন্‌মনা করে। নন্দকিশোরের বেলায় আজ তা'ই ঘটিল রাত্রে—নন্দর নিদ্রিতাবস্থায়।

নারীর রূপ আর আকর্ষণ, বিভ্রান্তকর সেই মোহন ইন্দ্রজাল, পুরুষ অত সহজে আর অত সত্বর ভুলিতে পারিলে পৃথিবীর বুক হাল্‌কা, কাব্য ক্ষুণ্ণ, এমন কি মরণশীল পুরাণ অপাঠ্য, আর পাগলের সংখ্যা চৌদ্দ আনা হ্রাসপ্রাপ্ত, হইত। তা যা'তে না হয় সেই জন্যই বোধ হয় নন্দকিশোর সেই রাত্রেই এক অভাবনীয় স্বপ্ন দেখিল।

স্বপ্ন ব্যাপারটাই অলীক, অর্থাৎ অমূলক, লোকে সাধারণতঃ তা-ই বলে; কিন্তু যার মূলের সন্ধান আপাততঃ প্রথম দৃষ্টিতেই পাওয়া গেল না তাহাকেই অমূলক বলা বোধ হয় সমীচীন

নয়। মানুষের বিস্মৃত অন্বেষণ, যাঞ্চা, যত্ন; অপূর্ণ ইচ্ছা, মুহূর্ত্তের কি যুগব্যাপী গোপন আকাঙ্ক্ষা, শোনা গল্প, দেখা ঘটনা, অর্থশূন্য কল্পনা ইত্যাদি জোড়াতাড়া দিয়া জগাখিঁচুড়ি স্বপ্নও নাকি লোকে দেখে, ভালো দেখে, মন্দ দেখে, একটা না না দেখে, ভাঙা ভাষা দেখে কোনোটার মানে হয়, কোনোটার তা' হয় না; কিন্তু, মূলে থাকে দ্রষ্টার চেতন কি সুপ্ত মনের গতি আর ক্রিয়া, তা' যেমনই হোক্ যতদিনকারই হোক্ জ্ঞানতঃ থাক্ কি অজ্ঞাতে থাক্, অর্থাৎ স্বপ্ন অমূলক নহে বলিয়াই স্বপ্ন-তত্ত্বজ্ঞের বিশ্বাস।

নন্দকিশোরের মত বাহ্যতঃ নির্ব্বিকার ঠাণ্ডা মানুষের বুকেও বোধ হয় রূপের অর্চ্চনা করিবার প্রচ্ছন্ন অভিলাষ ছিল—কিন্তু যে অনুপম আশ্রয়ে স্বপ্নের সৃজন হইবে তাহা আগে সে দেখে নাই বলিয়াই বোধ হয় আগে সে স্বপ্ন দেখে নাই। আজ স্বপ্নসৃষ্টির সেই অনুকূল অবলম্বন পাইয়া সে স্বপ্নটা দেখিল—

দেখিল, মণীন্দ্র বাবুর স্ত্রী, অনুপমা পুরনারী, যাঁহার ভয়ে সে বাক্স বিছানা এবং একুশ দিনের বেতন ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছে তিনি, একখানি অতিশয় উজ্জ্বল সিংহাসনে বসিয়া আছেন—পদযুগল সংস্থাপিত করিয়াছেন অতি শুভ্র গজদন্তনির্ম্মিত আর ক্রমনিম্ন একখানা পাদপীঠের উপর অস্তমিতপ্রায় সূর্য্যের লোহিত দীপ্তির তুল্য গাঢ় রক্তবর্ণ বসন প্রান্ত তাঁর গুল্‌ফ চুম্বন করিয়াছে আর বিশ্বাস করুন যে, সে, অর্থাৎ নন্দকিশোর তাঁর পদ প্রান্তে বসিয়া দ্বিরদরদনির্ম্মিত

শুভ্রাসন আর বসনের লোহিতরাগযুক্ত প্রান্ত লক্ষ্য করিয়া অক্লান্তভাবে পুনঃপুনঃ পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতেছে…

নন্দ আরো দেখিল যে, তাঁর মুখখানা বিষণ্ণ, এবং তা' বিষণ্ণতার ছায়া ম্লানিমার অনুলেপনে চমৎকার অভয়প্রদ আর স্নিগ্ধ দেখাইতেছে।

ঐ চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে করিতে স্বপ্ন কখন বিলীন হইয়া গেছে তা' নন্দকিশোর জানে না। এ-স্বপ্ন তেমন স্বপ্ন ও নয় যাহাতে বুক ধড় ফড় করিয়া রোমাঞ্চিত কি উত্তেজিত অবস্থায় মানুষের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। স্বপ্ন দর্শনের পরই নন্দকিশোরের ঘুম ভাঙ্গিল না; এবং সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিবার পরও স্বপ্ন বৃত্তান্তই যে তাহার মানসিক সকল বিষয়ের সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া উদিত হইল তাহাও নয়। খানিক্-ক্ষণ এদিক ওদিক্ করিবার পর এবং মা ও বিষ্টুর সঙ্গে দু' চার-বার কথোপকথনের পর মুখ ধুইতে বসিয়া খড়ি মাটি দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে অকস্মাৎ তার মনে পড়িয়া গেল যে, সে স্বপ্ন দেখিয়াছে। স্বপ্নটা মোটেই বড় নয়—মাত্র ইহাই যে, একটি নারীমূর্ত্তির পায়ে সে ফুল দিতেছে; কিন্তু নারীটি যেমন, স্বপ্নের সেই অংশটাই স্বপ্নে প্রত্যক্ষে একাকার হইয়া একে-বারে ঝক্ মক্ করিয়া উঠিল—নন্দকিশোরের অন্তর যেন আলোকিত হইল…

দন্ত ধাবন সে দ্রুতবেগেই করিতেছিল—স্বপ্ন ঐ ভাবে মনে পড়িয়া যাইতেই তার হাতের সে কাজটা মুহূর্ত্তেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, তারপর শ্লথভাবে চলিতে লাগিল, এবং তারপর

একটা অপরাধ হইতেছে মনে করিয়া নন্দকিশোর পূর্ব্বের চাইতেও দ্রুতবেগে দাঁত মাজিতে লাগিল...

ত্রিলোকপূজ্য দুর্জ্জয় দেবগণ এবং তাঁদেরও বরেণ্য মহাতপা মুনিগণ যে বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক অন্যথাচরণ করিতে পারেন নাই—লজ্জাহীনের মতো পরাভব স্বীকার করিয়াছেন—নন্দকিশোর, মাটির মানুষ, সেই কার্য্যসাধন করিতে গেল হুহু শব্দে দাঁত মাজিয়া—দাঁত মাজিয়া সে রূপের প্রভাব পরিবেশ ভগ্ন বা অতিক্রম করিবে !···সে অঘটন ঘটিল না ; রূপের প্রভাব আর পরিবেশের মধ্যেই তার চিত্ত বিচরণ করিতে লাগিল···অপরাধ হইতেছে জানিয়াও সে অনুভব করিতে লাগিল সাবানের সেই ঘ্রাণটি, যা' তাহাকে মরীচিকার মতো ভুলাইয়া ভুলপথে লইয়া গিয়াছিল।—বায়ুবাহিত সেই ঘ্রাণের অনুসরণ করত অগ্রসর হইতে হইতে তার গতি আচম্বিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে দৃশ্য দেখিয়া সে-দৃশ্য তার এখনই মনে পড়িল না ; কিন্তু বরবর্ণিনীর যে অঙ্গ সৌরভ তাঁর অঙ্গচ্যুত হইয়া তার নাসিকায় প্রবেশ করিয়া বহুক্ষণ স্থিতিলাভ করিয়াছিল, স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির শান্ত কোমল বিষন্নতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া, আর ঘনীভূত হইয়া, সেই সৌরভটুকু যেন তার চৈতন্যের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল, এবং তাহা ঘটিতে লাগিল যেন বলপূর্ব্বক দ্রুত হস্তে দাঁত মাজিয়া তাহাকে নিবারণ করা গেল না।

ছোট ভাই বিষ্টু আসিয়া বলিল,—দাদা, বৌদি বল্‌ছে, তোমার মুখ ধুতে আজ বড়ো দেরী হচ্ছে।

—যাই। বলিয়া স্ত্রৈণ নন্দকিশোর তাড়াতাড়ি কুল কুচা করিতে লাগিল।

বিষ্টু বলিল, চা ভিজিয়েছে। নন্দকিশোর পুনরায় বলিল, যাই। নন্দকিশোর রান্নাঘরের ভিতরে মমতার সম্মুখে বসিয়াই চা খায়। মুখ ধুইয়া সেখানেই সে গেল—চা খাইতে লাগিল, আর, তার মুখে মৃদু একটু হাসি লাগিয়াই রহিল···

তার সেই হাসির দিকে চাহিয়া মমতা জানিতে চাহিল, হাস্‌ছ' যে অমন করে ?

—কেমন করে'?

—বদ্‌মত্‌লবী লোক মতলব ঠিক্ করে ফেলার পর ঐ রকম একটা তুষ্টি ফুর্ত্তির হাসি হাসে।

নন্দকিশোর মমতার চাতুর্য্যে অবাক্ না হইয়া পারিল না, এবং তার মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে ছায়াচ্ছন্ন হইয়া গেল—তারপরই সে হাসিয়া বলিল—আমি ভাব্‌তাম, তুমি বুঝি সরল অনভিজ্ঞ লোক ; তা' ত, নয় ! বদ্‌মত্‌লবী লোক মত্‌লব ঠিক্ করে' ফেল্‌লে তার মুখের চেহারা কেমন হয় তা' জানো দেখ্‌ছি !

মমতা হাসিয়া বলিল, নিজের চোখেই দেখেছি যে অনেকবার।

—কোথায় ?

—বাড়ীতেই। বড়্‌দা মেজ্‌দাকে জব্দ করার ফিকিরেই থাকে ; ফিকিরটা খাটাবার আগে সে ঐরকম অল্প অল্প হাসে। বাবা মা কতদিন তার চালাকি ধরে ফেলেছেন তার ঠিক্ নাই। আমরা কতদিন তা'-ই নিয়ে হাসাহাসি করেছি।

—তা'ইবলো ঘরোয়া নির্দ্দোষ ব্যাপার। কিন্তু আমি ত' বিষ্টুকে—

—তা' ত' নয়ই। আমাকে নয় ত' ?

—উঁ হুঁ। আমি হাস্‌ছিলাম কেন জানো ?

—কেন ?

—নন্দ মিথ্যা কথা খুব বলে ; বলিল—

—সাপ স্বপন দেখেছি...

—অজগর না হেলে ?

—কিংবদন্তী তা' কিছু বলে না—সাপ হলেই হল...

—বাজে কথা যাক্‌। ওরা তোমার খোঁজ করবে না ?

—না করাই সম্ভব।

—মণীন্দ্রবাবু কর্‌তে পারেন।

—কেন ?

—যে কারণে তিনি তোমাকে বাহাল করেছিলেন ; বেশি বেশি পাশ করা বড় বড় লোককে তিনি চান নাই। কেন বলো ত ?

—আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর কথা নিয়ে উল্লাস করার সুবিধে হবে ভেবে হয়তো ; কিম্বা—

বাধা দিয়া মমতা বলিয়া বসিল, খুব হাল্‌কাভাবে, যাহাকে বলা হইতেছে সে কিছু মনে না করিতে পারে এম্‌নি নির্লিপ্ত-ভাবে হাসিতে হাসিতেই বলিল,—তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তুমি উল্লাস করতে যাওনি ত' ?

পরস্ত্রী তাহাকে কামনা করিয়াছে, স্বীয় স্ত্রীর কাছে সজ্জন

নন্দকিশোর তাহা বলিতে পারিল না; নিজে সে দোষী নয়, সুতরাং কেবল বলিল, যাঃ।

—আর কি বল্‌তে যাচ্ছিলে বলো।

—কিম্বা অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত লোককে কাজে লাগালে কাজ হারাবার ভয়ে সে খুব মন দিয়ে পড়াবে এই জন্যেও হতে পারে। বেশি বেশি পাশ করা লোকের আরো বড় বড় যায়গায় ডাক্ হতে পারে—কিন্তু আমার মতো লোকের সে সুযোগ নাই—যা' পেয়ে গেলাম তা'-ই যথেষ্ট মনে করে' এক জায়গায় টিকে থাকার ইচ্ছাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। ভগবান জানেন কি তাঁর উদ্দেশ্য!

নীলাম্বরির ব্যাপারটা এই সূত্রে নন্দ'র মনে পড়িল; তখনও ভালো লাগে নাই, এখনও কৌতুকাবহ মনে হইয়াও সে হাসিতে পারিল না—ঘটনাটা শিক্ষাপ্রদও বটে: যেন তাহাকে চির-রহস্যের তীরে আনিয়া একটা কুহক সুন্দর আবেদনের দিকে তাহার চোখ ফুটাইয়া দিয়াছে···

নন্দকিশোর উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল—কিন্তু বড় লোকের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আর যাচ্ছিনে। বলিয়া চায়ের পেয়ালা প্রায় উপুড় করিয়া শেষ-চুমুকটা দিয়া সে বাহির হইয়া আসিল; এবং তার বেজায় মনে পড়িতে লাগিল স্বপ্নের সেই বিশিষ্ট অংশটা যাহাতে সে সিংহাসনাসীনা রমণীর পায়ে ঘন ঘন পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে···

চমকপ্রদভাবে হঠাৎ তাঁর আবির্ভাব হইয়াছিল—মুহূর্ত্তের জন্য সে চোখ তুলিয়াছিল; তাঁহার মুখচ্ছবি অনিন্দ্যসুন্দর মনে

হইয়াছিল। কিন্তু মস্তিষ্ক এমনি চতুর, বিশ্বাসঘাতক, আর ধারণক্ষম যে, মুহূর্তের সেই ঝলকটিকে একটা গুপ্ত কোটরে সে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—নিদ্রার সুযোগ আবদ্ধ ছবিকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে' অর্থাৎ স্বপ্নে তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। মস্তিষ্কের বজ্জাতির দরুণই স্বপ্নে তাঁহাকে সে পুনরায় দেখিয়াছে। তিনি অত্যন্ত মহিমময়ী বলিয়াই তাঁহাকে না হয় সিংহাসনে বসানো হইয়াছে—পাড়ের রং যেমনই হোক্ বসন একখানা থাকিবেই; কিন্তু ফুল দিবার তাৎপর্য্য কি? তা আবার একটা দু'টো নয়, অঢেল। ঐ ফুল দেওয়াতেই পরস্ত্রীর রূপের সম্মুখে পরাভব আর নতি স্বীকার করা হইয়াছে, এবং মনের জঘন্যতা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। স্বপ্নের এ স্থানটা একেবারেই অমূলক। সে সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল; আর একবার দেখিবার বাসনা, কি ভোগের কামনা, ঘৃণাক্ষরেও তার সম্বিতে অঙ্কুরিত হয় নাই ত'।

ভয়ংকর বিস্মিত হইবার পর নন্দকিশোর মাকে ডাকিয়া বলিল,—মা, আমি একটু বেরুলাম।

—বিষ্টুকে পড়াবিনে? তোর কাছে পড়বে বলে বই নিয়ে বসে আছে।

—আসি এখন একটু ঘুরে'—সারাদিনই পড়াবো।

জামা জুতা পরিয়া বাহির হইবার সময় নন্দকিশোরের মুখে হাসি ছিল; ছ্যাঁৎ করিয়া তার হুঁশ হইল, সে হাসিতেছে...ব্যস্ত হইয়া সে এদিক্ ওদিক্ তাকাইল; তখন তার হাসি দেখিয়া মমতা মন্তব্যসহ, আর কেমন একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

লইয়া, কারণ জানিতে চাহিয়াছিল; এখন আবার তার হাসি দেখিলে পাগল মনে করিবে।

কিন্তু মমতা তখন হেঁশেলে ব্যস্ত।

একটু ঘুরিতে বাহির হইয়া নন্দকিশোর অনেক ঘুরিয়া অনেক বিলম্বে বাড়ী ফিরিল। এতটা সময় সে আর কিছু চিন্তা করে নাই, কেবল চিন্তা করিয়াছে এবং অনুভব করিয়াছে মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে তার নিজের আচরণ; নিজের আচরণ এবং তার হেতু বিশ্লেষণ করিয়া সে আবিষ্কার করিল যে, সেখানে সে ভয় পাইয়াছিল—এত ভয় যে তার ইয়ত্তা নাই। মণীন্দ্রবাবু তার অন্নদাতা প্রতিপালক বলিয়া নয়, তিনি শক্তিশালী লোক বলিয়া, এবং বাড়ীর ভিতর তাহার প্রতি যথেচ্ছ আচরণ করিবার ক্ষমতা তাঁর আছে বলিয়া, তার দুর্ব্বল চিত্তে সহজাত যে ত্রাস প্রচ্ছন্ন ছিল, একটুখানি অপরাধবোধের সূত্রেই তাহা অসাধারণ উৎকট আকার লাভ কবিয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ঘাম ছুটাইয়া ছাড়িয়াছিল; তার পবিত্রতা কালিমালিপ্ত হইতেছে বলিয়া সে আদৌ ক্ষুব্ধ হয় নাই—এমন কি, তা' হওয়া না হওয়ার কথা তার মনেই পড়ে নাই। মণীন্দ্রবাবুর কথাবার্ত্তা কেমন যেন রহস্যময়, আর, অহেতুক বলিয়া প্রলাপ মনে হইত—কেমন একটা অন্ধকারের

ভিতর হইতে, তার অগোচর স্থান হইতে, তিনি যেন উঁকি মারিতেন ; উহাতেই, ব্যাপারটা দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই তার ভয় করিত। তার স্ত্রীর প্রসঙ্গে তাঁকে, কিছু অতিরিক্তই আগ্রহান্বিত দেখা যাইত ; কিন্তু সেটা তেমন ভয়ের কারণ হইয়া ওঠে নাই , যথার্থ ভয়ের কারণ ছিল মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রীর উগ্রতা, আধুনিক ভাব ভঙ্গীর তীব্র প্রকাশ মাত্রাধিক্য। ...মমতার মৃদুতার আর কোমলতার এবং তাহারই ভিতর তার প্রণয় অশেষ বিহ্বলতার তুলনা নাই ; সে কেবল মৃদু আর কোমলই নয়, সে যেন তাহারই জীবন্ত ছায়া—জীবনের পক্ষে এত অনুকূল এমন সুস্থ আন্তরিক আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি করিয়া সে নিজে থাকে এবং তাহাকে রাখে যে, তাহাকে পরম আপন মনে করিয়া আরামের অন্ত থাকে না; কিন্তু মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী যেন অজ্ঞাত লোকাভিমুখিনী ক্ষিপ্র একটি জ্যোতির স্রোত—তাহাকে স্পর্শ করাই বিপদ, তাহাতে অবগাহনের কথা ত' চিন্তা করাই যায় না।

কিন্তু স্বপ্নে দেখা মুখখানা অতিশয় বিষণ্ণ—তাহার প্রত্যাখ্যান তাঁর পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়াছে বুঝি! স্বপ্নে কত তত্ত্ব, কত সত্য, কত তথ্য জানা যায়—ইহা ত, সবাই বলে। তাঁর অন্তরের এই ব্যথাটুকু' এই করুণ নিগূঢ় তথ্যটি, সত্য বলিয়াই জাগ্রত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে দেখা দিয়াছে—মানুষের মনের সর্ব্বজ্ঞতা স্বপ্নযোগে কাজ করিয়াছে। ...তারপর বিষণ্ণ মুখে নিস্তব্ধ হইয়া পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণও খুবই আশাপ্রদ এবং উৎসাহজনক

নম্রতা—ভাবিতে ভালই লাগে; এমন কি, মনে মনে তাঁর নিকটবর্ত্তী হইতেই যেন ইচ্ছা হয়!

তারপর নন্দকিশোরের মনে পড়িল, একটি চঞ্চল উদ্ভ্রান্ত মুহূর্ত্তের জন্য উর্দ্ধমুখ হইয়া সে সেই অপরিমেয় রূপরাশির দিকে নেত্রপাত করিয়াছিল—ভাবিতেই নন্দকিশোরের মনে দাহজনক অনুতাপ এবং তাহারই পাশে অস্থিরকর তৃষ্ণার সঞ্চার হইল। বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেও তিনি কিছু মনে করিতেন না—তিনি দেখা দিতেই আসিয়াছিলেন; সে নির্ব্বোধ এবং দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়াই ভয়ে দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল: এক মুহূর্ত্তে যাহা সে দেখিয়াছিল তাহা অনন্তকালস্থায়ী অপূর্ব্ব উপভোগ্য সঞ্চয় বলিয়া এখন সে মনে করিতে পারিল না...

স্বপ্নের মূর্ত্তির সঙ্গে মূর্ত্তির মিল নাই; দ্বিতীয় মূর্ত্তি রক্তহীন দেহের মতো, তার নিজস্ব চাহিদা নাই; কিন্তু সেই মূর্ত্তির তা' ছিল—পুরুষের চিরাভিলষিত দান লইয়া তিনি সম্মুখে অবতরণ করিয়াছিলেন···

কিন্তু বড় স্থূলভাবে, আর, অত্যন্ত অকস্মাৎ, এবং স্থূল আর আকস্মিক বলিয়া যেন নিঃশ্বাসরোধকর একটা আঘাত হানিয়া মৃদুতা আর মন্থর কোমলতার সঙ্গে সে আত্মসম্মাণ আসে তাহাই হয় অনিবার্য্য; শিবের জটায় গঙ্গাবতরণের মতো দুর্জ্জয় বেগ সংবরণ তার অসাধ্য বলিয়াই তার ত্রাস উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু পরম সুখের বিষয় ইহাই যে, স্বপ্নে তিনি দেখা দিয়াছেন কমনীয়

কোমল স্তিমিত মূর্ত্তিতে। সম্ভবতঃ তাঁর ঐ মূর্ত্তিটাই স্বাভাবিক মূর্ত্তি—ক্ষিপ্র অধীরতা কেবল লোক দেখানো বহিরঙ্গ—চমক্ লাগাইবার আর শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য প্রতিপাদনের উপায় মাত্র। তিনি যার একান্ত আপন এবং যার বশবর্ত্তিনী তার কাছে নিশ্চয়ই তিনি অবনত, তার কাছে ক্ষুদ্রতর আর শিথিল হইয়া এবং নিঃশেষে বিলীন হইয়া তার সঙ্গে পিশিয়া থাকাই চরম সার্থকতা ইহা তিনি নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম, এবং অনুভব করিয়া থাকেন...

এখানে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়া দিয়া নন্দকিশোর ভারি হাল্‌কা বোধ করিতে লাগিল···

বিষ্টু তখন তার হেপাজতের অধীনে বসিয়া পড়িতেছে স্বার্থপর মানে যে অন্যের ইষ্টানিষ্ট না ভাবিয়া কেবল নিজের ইষ্ট খোঁজে।

নন্দকিশোর জানিতে চাহিল, স্বার্থপরের ইংরেজী কি?

—সেল্‌ফিস্।

তারপর বিষ্টু মুখস্থ করিতে লাগিল, লোক মানে মনুষ্য··· বিষ্টুর পড়া চলিতে লাগিল, এবং নন্দকিশোরের মনের চারি প্রান্তই একটা অপরূপ আলোকে দীপ্ত করিয়া জাগিয়া রহিল একটি অলৌকিক রূপবৈভব সম্পন্না নারীর করুণ মূর্ত্তি—এবং তাঁর যে মূর্ত্তি বিষণ্ণ নয়, প্রফুল্ল, সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করিয়া লইয়া আসিবার অপরিমেয় লালসা··· একেবারে স্থির সংকল্প হইয়া, আর অপরাজেয় নিরঙ্কুশ মন

লইয়া তাঁহাকে উত্তমরূপে, নিষ্পলক চক্ষু মেলিয়া নিরবকাশ দৃষ্টিতে, নিরীক্ষণ করিতে হইবে সেই-রূপের ছবি দিয়া অঙ্গ মণ্ডিত এবং বক্ষকুহরপূর্ণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় রাত্রে নন্দকিশোর স্বপ্নে কাহাকেও বা কিছুই দেখিল না; কিন্তু মনে মনে পূর্ব্ববৎ ভারি সজাগ থাকিয়া দিনের দু'টা পর্য্যন্ত শুইয়া বসিয়া কাটাইল—রূপসন্দর্শনের আকাঙ্খার একটা স্রোত নিরন্তর বহিতেই লাগিল...

মনীন্দ্রবাবুকে যদি অসন্তুষ্ট দেখা যায় তবে তাঁহাকে অনুরোধে বশীভূত, কৃপাপ্রার্থনায় দ্রব, স্তবে তুষ্ট এবং পরমেশ্বরের অজস্র অনুগ্রহে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি আরো হোক্, তার উপরে আরো হোক্, এবং তার উপরেও আরো হোক্, ত্রিগুণিত এই আশীর্ব্বাদ অফুরন্তভাবে করিতে হইবে, কারণ, সে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব এবং মন্দ্রণীবাবু দত্তোপাধিক কায়স্থ—সে দীন হীন, তিনি লক্ষ্মীমন্ত।

অসময়ে হঠাৎ যেন সে মনঃস্থির করিয়া ফেলিয়াছে এম্নি ব্যস্তভাবে নন্দকিশোর বেলা দু'টার সময় মাকে ডাকিয়া বলিল, মা, তিনটের গাড়ীতেই আমি সেখানে একবার যাবো।

মা বলিলেন, যাও, জিনিসগুলো আর মাইনেটা নিয়ে এস। মাইনে চাওয়ার মুখ রেখেছ ত?

নন্দকিশোর হাসিয়া বলিল—তা আছে, মা। আমি তেমন কিছু দুর্ব্ব্যবহার তাঁদের সঙ্গে করিনি।

—না করলেই ভালো। লোকে গরীব মনে করুক, অল্প বিত্তের মানুষ মনে করুক, কিছু যায় আসে না; কিন্তু যেন অভদ্দর মনে না করে।

নন্দকিশোর হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল—কথা কহিল না।

ভদ্র বলিয়াই সে ভীরু এবং ভদ্র আর ভীরু বলিয়া যে-বস্তু সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহার তুলনা নাই—তার তুল্য বন্ধন, অত্যাজ্য সম্পদ সংসারে আর নাই। স্বেচ্ছায় নিবেদিত সে বস্তু ত্যাগ করিতে পুরুষ কদাচ পারে নাই—অভদ্র প্রতিপন্ন হইবার, বিধাতা বিমুখ হইবার রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিবার, সমাজ হইতে বিতাড়িত হইবার এবং কল্পনাতীত আরো অনেক প্রতিফল পাইবার ভয়েও পুরুষ নিরস্ত হয় নাই—রূপৈশ্বর্য্য হস্তগত করিতে সে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে, প্রাণপণ করিয়াছে; সর্ব্বনাশের ভয় কিন্তু করে নাই; রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে, মুণিগণ জপ তপে আর দেবতারা ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, ভদ্রভাব মোটেই দেখায় নাই।

মানুষের মন আকাশের চাইতেও উদার, ততোধিক প্রশস্ত কত লোককে সমাদর করিয়া সেখানে স্থান দান করা যাইতে পারে এবং যথাযোগ্য আসন দিয়া আনন্দ উপভোগ করা যাইতে পারে তাহার ইয়ত্তাই নাই। কত লোককে ধারণ করিয়া মন নিয়ত আপনাকে সার্থক করিতেছে, কত সার্থক

করিতে চাহিতেছে এবং আরও তৃষ্ণাপহারক কত সত্তার সন্ধান করিতেছে তাহা ভাবিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। প্রতিদিনের হঠাৎ-ভাল-লাগার চঞ্চল যাতায়াতের আনন্দ হইতে শুরু করিয়া চিরদিনের প্রিয় বস্তু, আর ধ্যানের বস্তু, আর সুখের বস্তু, আশার বস্তু, প্রভৃতি অসংখ্য বস্তু কি একই সঙ্গে মনের ক্ষেত্রে আপন আপন স্থানে বিহার করিতে পারে না কি? কিশোর মীমাংসা করিল যে তা পারে, সুন্দর ভাবেই পারে।

ষ্টেশন নিকটেই, গাড়ীরও সময় আছে—

নন্দকিশোর চিন্তামগ্নভাবে উঠানে পায়চারি করিতে করিতে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল, মমতা মায়ের সাহায্যে এবং উপদেশে দিশা পাইয়া কি একটা সেলাইয়ের কাজ চালাইতেছে...

মমতার কাছে অবিশ্বাসী হইতে অবশ্যই সে চাহে না; মমতার কাছে সে অবিচ্ছিন্নভাবে ঋণী; কারণ, মমতা ভারি স্নিগ্ধ, সুখদায়িনী আর প্রিয়বাদিনী, আর ভারি অকপট। তার স্থান হৃদয়ে অটুটই রহিল এবং রহিবে; মমতা চন্দ্র; তার গৌরব তার নিজস্ব; তার মর্য্যাদা স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত আছে...তবে, একটি সুপ্রভাতে অরুণোদয়কে বরণ করিতে বাধা কি, নিষেধ কোথায়!

কিন্তু মমতা একটু ম্লান এই হিসাবে যে সে কখনো হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিয়া কলকণ্ঠে আহ্বান করে নাই—স্বামীর প্রতি তার যা অবিস্মরণীয় কর্ত্তব্য তাহাই সে মনঃপ্রাণ নিবিষ্ট

করিয়া নিষ্ঠার সহিত কায়মনোবাক্যে দিবারাত্রি পালন করিতেছে, সে অধর্ম্মাচরণ করে না, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার উদ্দাম বেগ আর প্রাপ্তির পরমোল্লাসে সে সৃষ্টি করে নাই, হিংসালু চৌর্য্য প্রবৃত্তি, যা নিয়ত সম্বিতে ক্রিয়াপরায়ণ রহিয়াছে বলিয়াই অভিনব কত চিন্তার উদ্ভব, নব নব কত আনন্দের বিকাশ হইতেছে, আর কতশত কর্ম্মের প্রেরণা জাগিতেছে, তাহাকে সে ·া গাইয়া দেয় নাই যে জাগাইয়া দিয়াছে জ্যোতিকিরীটিনী সেই রূপময়ীকে প্রাণ ভরিয়া একবার দেখিতেই হইবে।

যাত্রাকালে নন্দিকশোর জিজ্ঞাসা করিল, মা, যদি থাকতে বলে ?

মা তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—থাক্‌তে যদি বলে তবে থেকো। ঐ কাজ যখন একটা দরকার তখন ওটা ছেড়ে' দ। উচিত কি না তা' তুমিই বুঝে'যা' হয় করো। আর-একজনকে ঠিক্ করেছে বলেছিলি না ?

নন্দকিশোর বলিল,—যদি সে না এসে থাকে! এমনও ত' হয়—কথা দিয়ে এল না। যাই! বলিয়াই রওনা হইয়া গেল—মাকে প্রণাম করিল না, কুণ্ঠাবশতঃ করিতে পারিল না। যে-উদ্দেশ্য লইয়া এবার সে যাত্রা করিতেছে তাহাতে সিদ্ধির প্রণামান্তে মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা মাকেই এমন অসম্মান করা যে সে অপরাধের ক্ষমা নাই।

ওদিকে বিষ্টু চেঁচাইয়া উঠিল'—দাদা, আমি ইষ্টিশনে যাবো তোমার সঙ্গে ?

মা বলিলেন,—কাজে বেরুচ্ছে, অম্‌নি পিছু ডাক্‌লি! —তারপর নন্দর কুশল কামনা করিয়া তাহারই উদ্দেশে বলিলেন,—ষাট, ষাট।

ওদিকে সাড়ে তিন আনা পয়সা দিয়া একখানা টিকিট কিনিয়া নন্দকিশোর গাড়ীতে উঠিল, এবং উঠিয়াই শুনিল, যুগ্মকণ্ঠে চমৎকার সঙ্গীতে চলিতেছে। অন্ধ ভিখিরী একটি বালকের সঙ্গে গলা মিলাইয়া গান করিতেছে—গানের মর্ম্ম ইহাই যে, অন্ধকে দান করিলে ভগবান্‌ তার, দাতার, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। অন্ধ হাত পাতিয়া যাত্রিগণের সম্মুখীন হইতে হইতে তাহার সম্মুখে আসিতেই নন্দকিশোর একটি পয়সা তাহার হাতে দিল; ভিখারী আশীর্ব্বাদ করিল, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্‌ বাবা। এই মামুলী আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তার দান সার্থক হইল; বোধ হয় সে কিছুক্ষণ খুশী হইয়াই থাকিত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল একটা অকৃতকার্য্যের কথা—আসিবার সময় মমতাকে কিছু বলিয়া আসা হয় নাই—তাহার কাছে বিদায় লইয়া আসা হয় নাই—ভুল হইয়া গেছে···মন যতই উদার প্রশস্ত হোক্‌, আর ধারণক্ষম হোক্‌, সেখানে একই সঙ্গে দু'টি বস্তুর অবস্থান ঘটিলে একটিকে প্রাধান্য দিতেই হয় —একটিকে আবৃত করিয়া অপরটি প্রোজ্জ্বল উন্নত হইয়া ওঠেই। মনে মনে অপরাধ স্বীকার করিয়া নন্দকিশোর ভারি অনুতপ্ত হইল—বেচারী মমতা মনে করিতেছে কি! মাকে লুকাইয়া চোখে চোখে চাহিয়া বেশ বিদায় লওয়া

যাইত—তা' লওয়া হয় নাই; হয়তো তার চোখে জলই আসিয়াছে। একই সঙ্গে দু'টি কিংবা বহু সত্তাকে চিন্তা আর অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যবহারের বেলায় মনোনিয়োগে তারতম্য দেখা দেয়ই। তার উপর নন্দকিশোরের মনে পড়িল, মমতা ঠাট্টার ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিন, "পরস্ত্রী লইয়া উল্লাস করিতে যাও নাই ত, "? আর্থাৎ সেই অপরাধের দরুণ তাড়াইয়া দেয় নাই ত'? তার সেখান হইতে রওনা হইয়া বাড়ীতে আসিয়া উঠার রকমটা সত্যই যেন কেমন। ক্রুদ্ধ হইয়া লম্ফঝম্ফ করা কি বেখাপ কিছু করিয়া ফেলা তার স্বভাবই নয়—সবাই তা' জানে; কাহারো উপর চোখ রাঙ্গাইয়া কট্‌মট করিয়া তাকাইতেই মমতা তাহাকে দেখে নাই। এই প্রকৃতির লোকটি চাকরি বুঝি যায় এই আশঙ্কা কি সন্দেহের বশে ধনী মনিবের সঙ্গে চটাচটি করিয়া বাক্স বিছানা আর বেতন ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিনই কুকর্ম্মের তাড়া খাওয়ার পর বিপদের ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়নের মতই তার চলিয়া আসার রকম। লক্ষণ দেখিয়া যা' বুঝা যায় সেইরকমই বুঝিয়া মাও জেরা করিয়াছিলেন—কিছুই অবিচার, করেন নাই। স্বামীর স্বাস্থ্য উন্নতি সুখ সুবিধা সম্বন্ধে স্ত্রীর যেমন উদ্বেগ আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সীমা নাই, তেম্‌নি একটি বিষয়ে সন্দেহও প্রচুর—সেটা হইতেছে চরিত্র। চরিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিবার এবং সতর্ক করিবার সময় মেয়েদের বুদ্ধিও খুব খোলে,

কথাও ফোটে। সে যাহাই হউক, মমতার কাছে বিদায় না লইয়া আসা ভারি অনুচিত কাজ হইয়াছে—তাহাকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, ব্যথা দেওয়া হইয়াছে।

চিন্তাগুলি অস্বস্তিকর—

অন্যমনস্ক হইবার অভিপ্রায়ে নন্দকিশোর এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে লাগিল, দৃশ্য বা ঘটনা হিসাবে চিত্তাকর্ষক কিছু চোখে পড়িলেই সেই-দিকে সে মনোনিবেশ করিবে; কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়িবার আগেই তার চোখে পড়িল তারই এক বন্ধু—নিজেকে এক গণনা করিয়া চতুর্থ ব্যক্তিই তার বন্ধু—দুই পায়ের ফাঁকের ভিতর ছাতাটা ছাড়িয়া দিয়া বেশ স্বচ্ছন্দভাবে বসিয়া আছে...

বন্ধুর সঙ্গে দৃষ্টির মিলন হইল—নন্দকিশোর বলিল, চলেছ?

—হুঁ। তুমিও চলেছ দেখ্ছি।

হুঁ।

—বিদ্যাদান করছ ত'?

—করছি।

—নিজের কিছু বাড়্ছে?

—হুঁ, দু'টাকা।

—না, না, তা বল্ছিনে, বিদ্যে··

নন্দকিশোর হাসিয়া দৃষ্টি টানিয়া লইল।

তারপর সে হিসাব করিয়া দেখিল যে, তার একুশ দিনের বেতন সাত টাকা মাত্র। ঐ সাত টাকা মণীন্দ্রবাবুর কাছে মুখ ফুটিয়া চাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ, কারণ, সে না বলিয়া

না কহিয়া চোরের মতো আচম্‌কা গা-ঢাকা দেওয়ায় সে ভদ্রতার এবং কর্ম্মত্যাগের রীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। স্তবে তুষ্ট এবং অনুরোধে বশীভূত করিবার পূর্ব্বেই হয়তো তিনি, উদরান্নের জন্য তাহাকে এবং তত্তুল্য গৃহশিক্ষক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া এমন নিদারুণ কটূক্তি বর্ষণ করিবেন যে, অপমানের চূড়ান্ত হইয়া যাইবে। শুধু অপমানিত হইবার ভয়ে মণীন্দ্রবাবুর গৃহে পূর্ব্বেই সে এত কাণ্ড করিলেও, এবং অকথ্য দুঃখ পাইলেও, বেতন সম্পর্কে কটূক্তির আর মানহানির ভয়টাকে সে তেমন তেজালো হইতে দিল না, কারণ, টাকা আর অন্তঃপুরিকায় স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ, ঠিক্ ততটা তফাত যতটা তফাত ভ্রূভঙ্গী আর ফাঁসিতে; প্রথমটির সম্বন্ধে নিয়ম অমান্য করিবার পর ত্রুটি বা অজ্ঞানতা স্বীকার করিয়া শাস্তি লঘু করিয়া আনা যাইতে পারে—ক্ষমা চাহিবার পথ থাকে; কিন্তু অপরটি সম্বন্ধে গণ্ডি অতিক্রম করিয়া অবোধ সাজা চলে না, কৈফিয়ৎ সাজানও চলে না…

স্তুতরাং টাকা চাহিলে মণীন্দ্র কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন সে উৎকণ্ঠা দমন করিয়া গাড়ীর ঝাঁকানি আর আওয়াজের মধ্যেই নন্দকিশোর ধ্যানস্থ হইল…ধ্যানযোগে সে দর্শন করিল বিষণ্ণ অতুলনীয় একখানি মুখ—দু'খানি পা, আর, সেই শুভ্র স্তুকুমার পদপল্লবদ্বয়ে অগণিত পুষ্পের স্তূপ —পুনঃপুনঃ অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া সে-ই ঢালিয়া দিয়াছে…

নন্দকিশোরের আনন্দ আজ উদ্বেল হইল।

তারপর সে দেখিল, ধ্যানযোগেই দেখিল, তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন—চঞ্চলতা আর কাঠিন্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিষ্কম্প শিখার মতো স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে পথ চাহিয়া আছেন। তাঁর এই মুর্ত্তিখানিই সে একবার অকম্পিত চক্ষে এবং অকুণ্ঠ চিত্তে অবলোকন করিবে—তৃপ্ত হইবে; তারপর সে বাক্স বিছানা বেতন লইয়া চলিয়া আসিবে, কিংবা থাকিবে—যেরূপ অবস্থা দাঁড়ায় তদনুসারে কাজ করিবে—মায়ের অনুজ্ঞাও তা-ই।

রূপই যদি না দেখিলাম তবে এতবড়ো চোখ দু'টা আর প্রচুর দৃষ্টিশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি কেন? কেবল পুস্তকের অক্ষর দেখিবার আর হোঁচট এড়াইবার জন্য?—মনে হইতেই নন্দকিশোর একটু হাসিল, এবং বিধাতাও বোধ হয় হাসিলেন।

(৪)

নানান্ তরঙ্গে মাথায় নাচিতে নাচিতে থামিয়া ট্রেণ-জার্‌নি'টা কাটাইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার পর মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীর উদ্দেশে চলিতে চলিতে নন্দকিশোরের পা থামিয়া আসিতে লাগিল। আপন গৃহের অভ্যন্তরে এবং খোলা জায়গায় নন্দকিশোরের যে চিন্তা, ইচ্ছা আর কল্পনা উল্লসিত হইয়া যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতেছিল।

মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীর সমগ্র ছবিটা আর আবহাওয়া মনে পড়িতেই তার মনের সেই স্বেচ্ছাচারিতা যেন একটি বলয়ের বেষ্টনের ভিতর আবদ্ধ হইয়া গেল—আর, সে বলয় যেন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল...এক কথায়, নন্দকিশোরের প্রাণে ভয় দেখা দিল। যত অল্প সময়ের জন্যই হউক, সে পরস্ত্রীর রূপদর্শন করিতে চলিয়াছে; কিন্তু তাহাতে তার অধিকারই বা কি, তার সুযোগই বা কোথায়! এমনও ত' হইতে পারে যাঁহাকে দেখিতে সে চলিয়াছে তিনি হয়তো মনের অত্যন্ত বিকল অবস্থায় দু' চারটা বেহিসাবী বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন; তজ্জন্য এখন তিনি অসহ্য অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন—তাহাই সম্ভব, এবং তাহার দরুণ অধিকতর প্রখরা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁর প্রখরতাই তাকে ত্রাসে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। স্বপ্নে দেখা মূর্ত্তি শান্ত কোমল সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই; নিশ্চিত আর প্রলুব্ধ হইবার পক্ষে স্বপ্নাদেশ ছাড়া আর কি আছে?···আগে এ বিষয়ে নন্দ কি প্রণালীতে চিন্তা করিয়াছিল তাহা তার একবিন্দুও মনে পড়িল না···

তবু, এই কষ্টকর অবস্থাতেই, নন্দকিশোর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং মণীন্দ্রবাবুর দরজার অদূরে পৌঁছিতেই তার সাক্ষাৎ হইয়া গেল রাখালের সঙ্গে। রাখাল দরজাতেই দাঁড়াইয়া ছিল—তাহাকে দেখিয়াই লাফাইয়া রাস্তায় নামিল, এবং দৌড়াইয়া আসিয়া তার হাত ধরিল...

রাখালের এই আচরণটা মধুর লাগিয়া নন্দকিশোর হাসিমুখে দাঁড়াইয়া গেল—

রাখাল বলিল,—আসুন, মাষ্টার মশায় ; কোথায় গিয়েছিলেন ? বাবা আপনাকে খুঁজেছেন খুব। আমাদের ইস্কুলের একটা ছেলে বল্‌লে, মর্গ্-এ দেখো গিয়ে, পাবে। মর্গ কি, মাষ্টার মশায় ?

নন্দকিশোর তার হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিল,—যেখানে বেওয়ারিস মড়া রাখা হয় তাকেই বলে মর্গ্।

রাখাল খুব রাগিয়া গেল, বলিল,—দেখুন অন্যায়, আপনার মত মানুষকে বলে মরেছে !

—তা বলুক। তোমার বাবা বাড়ীতে আছেন ?

আছেন, ওপরে আছেন। আপনি এসেছেন শুন্‌লে এখুনি নাম্‌বেন।

এতক্ষণ পরে নন্দকিশোরের মনে হইল, হঠাৎ চলিয়া যাইবার একটা সমীচীন কারণ ত' ভাবিয়া রাখা হয় নাই! ভারি অন্যায় হইয়া গেছে।

রাখাল তাহাকে ঘরে তুলিল, চেয়ারে বসাইল, এবং উপরে খবর দিতে দৌড়াইয়া গেল আর, অশান্তি দুরন্ত হইয়া উপস্থিত হইল নন্দকিশোরের প্রাণে…কিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, এবং তাহার কর্ত্তব্য আর বক্তব্য তখন কি দাঁড়াইবে।…নন্দকিশোরের ধ্যানজগৎ খোলা হইয়া গিয়াছিল খানিক্ পূর্ব্বেই, এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গেল।

মণীন্দ্রবাবু নন্দকিশোরকে বেশিক্ষণ অমনি বসাইয়া

রাখিলেন না—খবর পাইয়াই দেখিতে আসিলেন, বা দেখা করিতে আসিলেন, এবং আসিলেন হাসিতে হাসিতে, গুম্ফযুগল বিস্তৃত করিয়া।

তিনি দরজায় আসিতেই নন্দকিশোর সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, নমস্কারও করিল, কিন্তু মণীন্দ্র তার নমস্কার লক্ষ্যও করিলেন তাঁর সে অবকাশই যেন নাই; বলিলেন, —আরে, ছিলে কোথায়? আমি তোমাকে খুঁজেছি ঢের, অবশ্য চীৎকার করে' নয়। চম্পট দিয়েছিলে যে? বলিয়া তিনি যাইয়া চেয়ারে বসিলেন—নন্দকিশোর বসিল তার তক্তপোষে।

বসিয়া মণীন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন অমন করে' একবস্ত্রে চম্পট্ দিয়েছিলে যে? জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি নন্দকিশোরকে যেন পরীক্ষা করিতেছেন এমনি নিবিষ্ট চক্ষে তার মুখের দিকে তাকাইয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন...

নন্দকিশোর বলিল—বাড়ীর জন্যে মনটা বড় উতলা হয়েছিল।

মণীন্দ্রবাবুর গোফ জোড়াটা হাসিতে ভরিয়া উঠিল, বলিলেন—তা হওয়া সম্ভব, কারণ, বাড়ী মানে স্ত্রী। কিন্তু বলে' যেতেও ত' পার্তে!

নন্দকিশোর চুপ করিয়া রহিল—

মণীন্দ্র বলিলেন,—তুমি যথেষ্ট সুশীল, অমায়িক আর ভদ্র তা' জানি; কিন্তু দেখ্ছি মিথ্যে কথা বল্তে তোমার বাধে না। সত্যি কি না?

শুনিয়া নন্দকিশোর ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি অবনত করিল, এবং অনুভব করিল, তার মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ঈষৎ লাল হইয়াছে...

মণীন্দ্রের গোঁফ আরো খানিক উত্তোলিত হইল; বলিলেন, —এই ত' ধরা পড়্‌লে, বাপু! চোখ নামালে আর লাল হ'য়ে উঠেছ। সত্যবাদী লোক কখনো চোখ নামায় না।—বলিয়া মাথা নাড়িলেন, যেন বুদ্ধির পাল্লায় তাঁরই জিত হইতেছে—ও পক্ষের মনের কথা তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন; তারপর বলিলেন,—বলোই না কারণটা কি...

নন্দকিশোর ভারি কাতর হইয়া বলিল,—আমাকে মাপ করুন।

মাপ আমি করেছি। তোমাকে সম্ভাষণের স্বর শুনেও তুমি বুঝ্‌তে পার্‌লে না, মাপ আমি করেই বসে আছি। কারণটা আমি জানি।

এমন অতর্কিতে আর এমন অনায়াসে এত বড়ো সাংঘাতিক কথা বলিতে কেবল মণীন্দ্রই পারে—চক্ষের পলকে মুখ আর তালু শুকাইয়া নন্দকিশোর আপন মস্তকে ভারি নির্জ্জিব হইয়া উঠিল। কারণটা উনি জানিবেন কি করিয়া? কি অনুমান করিয়া বসিয়া আছেন। স্ত্রীর মুখে তিনি বিপরীত কিছু শোনেন নাই ত'! দণ্ড দিয়া তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া শেষ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে খানিক্ খেলাইয়া মজা দেখিতেছেন না'ত'?

কিন্তু তা নয়—মণীন্দ্রনাথের উৎফুল্লতা স্বভাবতই অপরাজেয়—

তিনি উৎফুল্ল থাকিয়াই বলিলেন,—শুকিয়ে আদ্ধেক হ'য়ে উঠ্‌লে যে, মাষ্টার! আমার স্ত্রীর উৎপাত। নয়?

মণীন্দ্রের এ প্রশ্ন এমনি যে তাহাকে অতিক্রম করা মানুষের সাধ্যাতীত—মানুষকে অস্থির সে করিবেই, কথা সে বলিবেই—কথা যেমনই হউক, যাহাই হউক...

নন্দও অস্থিরভাবেই মুখ তুলিয়া তাকাইল, জবাব দিতে নয় প্রশ্নকর্ত্তাকে উপলব্ধি করিতে। ...উৎপাতের অর্থ কি তাহা কাহারো না বুঝিবার নয়। সেই রকম উৎপাত করিয়া একটি পরপুরুষকে স্ত্রী গৃহ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই প্রসঙ্গে এমন উৎফুল্লতা কেমন করিয়া মানুষের আসিতে পারে। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, মণীন্দ্রের তা' অপর্য্যাপ্ত মাত্রায় আসিয়াছে। ইঁহার ধৈর্য্যের তারিফ করিতে হয় না, ইঁহার বীভৎস অসাড়তার দরুণ ইঁহাকে অবজ্ঞা করিতে হয়!

শক্ত হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া নন্দকিশোরকে আর-কিছুই করিতে হইল না—হাঁ, না, কোনো জবাবই দিতে হইল না; নিজের প্রশ্নের আরো যা' ব্যাখ্যা আছে তা উদ্ঘাটন করিলেন মণীন্দ্রই—

বলিলেন,—তুমি দাঁতে দাঁত চেপে' আছ বেশ, থাকো। তুমি হয়তো ভাব্‌ছ, আমার সন্দেহ বাই আছে—তা-ই টোকা মেরে একটু পরীক্ষে করছি; কিংবা সবই আমার মিথ্যে কথা

আর আমি খুব নির্লজ্জ!... তবে শোনো এক মজার কথা; প্রথমেই জানাই যে উনি আমার স্ত্রী নন্...

প্রথমেই এই খবরটা জানাইয়া, অর্থাৎ একটা ধাক্কা দিয়া, নন্দকিশোরের চোখের আঁতকানোটা তিনি সস্মিত মুখেই উপভোগ করিলেন; তারপর বলিলেন,—তোমার কাছে এ-সব কথা বল্‌ছি কেন জানো?

নন্দকিশোর মাথা নাড়িল—তাহাকে গুহ্য কথা কহিবার কারণ সে জানে না।

মণীন্দ্র তা' জানাইলেন—

বলিলেন, আমার বয়স চল্লিশ, তোমার বয়স তেইশ, আর, তুমি পালিয়েছ বলে'। আমি কিন্তু ধরে' নিলাম, আমার স্ত্রীর উৎপাতেই পালিয়েছিলে। কাজেই তুমি আমার পরম বিশ্বাসভাজন, তোমার শুভ আমি একান্তভাবেই চাই!.. তারপর শোনো উনি আমার স্ত্রী নন্। তবে কে? নিশ্চয়ই তা জান্‌তে তোমার কৌতূহল হয়েছে। উনি আমার খুড়তুতো ভগিনী...

বাক্য আর ভঙ্গীর সংযম প্রভুর সম্মুখেই শূন্যে উড়াইয়া দিয়া নন্দকিশোর বলিয়া উঠিল; "বলেন কি"?—নন্দ যেন লাফাইয়া উঠিল।

কিন্তু মণীন্দ্রের স্নায়ু সাপের গায়ের চাইতেও ঠাণ্ডা; তিনি হাসিয়া পরিহাসের সুরে বলিলেন,—আরে, আরে থামো। তুমি যে সেই কোব্‌রেজের বড়ির মতো কর্‌লে! তার বড়ি নাকি শিশির ভিতর খালি লাফাত'! লাফিও না অত

খুড়তুতো ভগিনী শুনেই তুমি লাফিয়ে উঠ্‌লে যে। স্বামী স্ত্রীর মতো বাস ত' না-ও করতে পারি!

নন্দকিশোর লজ্জা পাইল—

মণীন্দ্র বলিলেন, যত পার লজ্জা পাও, কিন্তু স্বামীর স্ত্রীর মতোই আমরা বাস করি। খুড়তুতো ভগিনী বটে, বল্‌লাম তা-ই, কিন্তু কেমন খুড়ো কেমন খুড়ী তা ত' কিছুই জানো না।

নন্দকিশোর হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল—

মণীন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—খুড়ো আমার বাবার সহোদর ভাই খুড়ো নন্, বাবার মামাতো ভাই—সে মামা আবার মায়ের সহোদর নন্, মায়ের মামাতো ভাই।

এত ঘুরিয়া সম্পর্কটা কিরূপ দাঁড়াইল তা নন্দকিশোরের মাথায় ঢুকিল না—সে পূর্ব্ববৎ কেবল মণীন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল ..

মণীন্দ্র বলিলেন—এখন খুড়ী। খুড়ীর কেচ্ছা শোনো। আমার ঐ খুড়োর ছিল একটি বুঝলে?

খুব অল্প সময়ের জন্য মাথাটা অতি সামান্য একটু কাত করিয়া নন্দকিশোর বুঝিতে দিল যে, ব্যাপারটা সে বুঝিয়াছে।

খুড়ো গিয়ে তাকে অধিকার করার আগেই তার একটি মেয়ে হয়েছিল—সেই মেয়েই ইনি। বলিয়া মণীন্দ্র নিজের অন্তঃপুরির উদ্দেশে চোখের ইঙ্গিত করিলেন; বলিলেন,—তারপর আমি সম্পর্কে সে-ই খুড়ীর বাড়ীতে যেতাম; এবং তারপর সেই মেয়েটি বড় হলে, আর আমার স্ত্রীবিয়োগ

হ'লে .. যাক্, অত খুঁটিনাটিতে কাজ নেই।... আশ্চর্য্য সুন্দরী ; আমি লোভ সংবরণ করতে পারিনি, তুমি পেরেছ। ধন্যি ছেলে বটে তুমি ! তোমার এখন যৌবনের পুরো জোয়ার, আর, রূপ আছে ; আমি প্রৌঢ়। তোমাকে তিনি আকাঙ্খা করেছিলেন, সত্যি কি না ?

নন্দকিশোর মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল নৈতিক লজ্জায় নহে, অপ্রয়োজনীয় উত্তরটা মুখে উচ্চারিত হইল না বলিয়া।

মণীন্দ্র উঠিতে উঠিতে বলিলেন,—এখানে থাকবে, না, নিয়ে থুয়ে বাড়ী যাবে ?

নন্দকিশোর থাকিবে বলিয়াই আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই সে সাগ্রহে সম্মত হইল ; বলিল—থাক্‌বো।

উপস্থিত সংকট কাটিয়া যাওয়ায় একদিকে নিরুদ্বিগ্ন এবং উনি এঁর বিবাহিত স্ত্রী নয় শুনিয়া অন্যদিকে কোথায় যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইবার হেতু পাইয়া নন্দকিশোরের নাক দিয়া একটা টানা নিঃশ্বাস নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

মণীন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, এইত' বাহাদুর ছেলের কথা ! থাকো। আস্‌ছে মাস থেকে তোমার মাইনে হ'ল পনরো।... তারপর জানিতে চাহিলেন, তোমার ছেলেপিলে হয়নি বুঝি ?

—আজ্ঞে না।

—তুমিই থাকো বাইরে বাইরে।—বলিয়া, যেন সম্পূর্ণ ধাতস্থ হইয়া মণীন্দ্র হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন ; পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিলেন—বলিলেন,—যে সব কথা

তোমায় বল্‌লাম তা যেন বাইরে যায় না।

নন্দকিশোর দাঁতে জিব কাটিল—

মণীন্দ্র আবার 'উপরে' গেলেন।

নন্দ তক্তাপোষে বসিয়া রহিল—বিরহের পর কাঠের এই তক্তাপোষখানাকে তার খুব আপন আর, দৃঢ় একটা আশ্রয় বলিয়া মনে হইল—দুই হাত তাহার উপর শক্ত করিয়া দিয়া সে সুখবোধ করিল··· সুখবোধ করিতে করিতে তার আনন্দ জন্মিল; সংযমের পুরস্কার হিসাবে তার পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। নন্দকিশোর মনে মনে হাসিল। ···মণীন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁর মুখে তাঁর পারিবারিক খণ্ড-কাব্য শুনিতে শুনিতে স্বেদ রোমাঞ্চ আতঙ্ক বিস্ময় প্রভৃতি বিপর্য্যয় উপর্য্যুপরি দেখা দিলেও, এখন তাঁর কথাগুলি আবোল-তাবোল মনে হ'য়ে নন্দকিশোর একটু ঠোঁট বাঁকাইল—সেই খণ্ডকাব্যের ভিতর সেও আছে, মণীন্দ্রের বর্ণণার মধ্যে সে প্রকাশ্যেই আছে, এবং অধুনা নির্ব্বিঘ্নেই আছে—

এবং সম্ভবতঃ শীঘ্রই খুব গুপ্তভাবে প্রচুর প্রাধান্যই লাভ করিবে...

নন্দকিশোর মনে মনে আরো খানিকটা হাসিল—মণীন্দ্রেরই কথার আলোড়নে তার অভীপ্সা আরও ফেনিল হইয়াছে—ঘুণাক্ষরেও তিনি তা' অনুমান করিতে পারেন নাই—

পারিবেন কেমন করিয়া ? পরচিত্ত চিরদিনই অন্ধকারময়। ...মণীন্দ্রের যে চঞ্চল ভঙ্গী, অশোভন বাক্যালাপ, স্ত্রীলোক সম্পর্কে প্রগলভতা, ইত্যাদি, অর্থাৎ যে ছ্যাব্‌লামি নন্দকিশোরের অশ্রাব্য তিক্ত মনে হইত, তাহাই যেন এখন তাহাকে আসন দিল, তিনি রাশভারি লোক হইলে তার মন মাথা তুলিতেই পারিতনা—মণীন্দ্র সলিতা ঠেলিয়া দিয়া দীপ উজ্জ্বলতর করিতেছেন—রস নিবিড় করিয়া তুলিতেছেন। ···ফিরিবার কারণ তিনি জানিতে চাহেন নাই; বোধ হয় তিনি ধরিয়া লইয়াছেন টাকার ব্যাপারটাই। ফ্রী আহার ও বাসস্থানসহ মাসে মাসে বসিয়া বসিয়া দশটা টাকা উপার্জ্জনের মায়া ত্যাগ করিয়া ধ্যুৎ বলা আর চলিয়া যাওয়া দরিদ্রের পক্ষে সম্ভব নহে; হয়তো ওঁকেও তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছেন।—

কয়েক মিনিটের মধ্যেই নন্দ এই তৃতীয়বার মনে মনে হাসিল।

মনে মনে হাসা খুবই সহজ—চতুরেও হাসে, বোকারাও হাসে; লোকে বুঝিলেও হাসে, না বুঝিয়াও হাসে; এবং কখনো কখনো সেই হাসি ঘা খাইয়া চাপা পড়িতেও বিলম্ব হয় না।

নন্দকিশোরের মনের হাসিটাকে আঘাত করিবার জন্যই বোধ হয়, পরদিন, বেলা ন'টা সাড়ে ন'টার সময় হঠাৎ একটা আবরণের আবির্ভাব হইল; বলরাম দাঁত মেলিয়া তার ঘরের ভিতর একবার উঁকি মারিল, তারপর ঘরের

চৌকাঠে দু'টি পেরেক মারিয়া পুরু একখানা পর্দ্দা টাঙাইয়া দিয়া গেল। নন্দকিশোর বিস্মিত হইয়া নিষ্পলক চক্ষে তাকাইয়া তাকাইয়া বলরামের কাজটা দেখিল, এবং অত্যন্ত আগ্রহ হইলেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, কার হুকুমে তার চোখের সামনে দৃষ্টি নিরোধক এই পর্দ্দা বিলম্বিত হইল! অযথা পরের কথা তার পছন্দসই নয়। কিন্তু কাপড়ের পর্দ্দা এমন কিছু অন্তরায় নয় যার অপসারণ ইচ্ছুক মানুষের পক্ষেও অসম্ভব, কিংবা দরকার হইলেও যা ঠেলিয়া ঠেলিয়া ভিতরে মানুষ বাহিরে আসিতে কি, বাহিরের মানুষ ভিতরে যাইতে পারে না; তথাপি ঐ পর্দ্দা একটি কঠিন নিষেধ, আর এ-ক্ষেত্রে যেন কারো অপরাধের নির্ম্মম সাজা। ...নন্দকিশোরের মনে মনে হাসাটা চাপা পড়িল।

নন্দকিশোর যথাসময়ে স্নান করিল; পরিপাটি করিয়া চুল হেঁচড়াইল; একটা গেঞ্জিও গায়ে দিল...

বলরাম আসিয়া ডাকিল, খেতে আসুন, বাবু।

রান্নাঘরেই সে খাইত, রান্নাঘরের দিকেই সে অগ্রসর হইতেছিল, বলরাম বলিল,—এদিকে আসুন, বাবু, ওপরে ঠাঁই হয়েছে। বলিয়া খানিক্ গা দুলাইল, যেন নন্দকিশোরকে উপরে লইতে আসিয়া সে কৃতার্থ হইয়াছে।

বলরামের অনুসরণ করিয়া সে উপরে উঠিল—দেখিল, প্রশস্ত বারান্দার এক স্থানে তার আহারের ঠাঁই হইয়াছে—আয়োজন রাজকীয়: সুবৃহৎ গালিচার আসন পাতা রহিয়াছে। আসনের গায়ে ফুলের অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

"পেট ভরিয়া খান, লজ্জা করিবেন না"। তা' ছাড়া, যে-থালায় ভাত দেওয়া হইয়াছে তাহাও প্রকাণ্ড এবং ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হইয়াছে বাটিতে বাটিতে…

সমারোহ আর সমাদর দেখিয়া নন্দকিশোর খুশী হইতে পারিল না, যেন একটু বিদ্রূপমুখী।

সে যাহাই হউক, নন্দকিশোর আরো দেখিল, একটি প্রৌঢ়া পরিচারিকা সেখানে উপস্থিত—অদূরে দাঁড়াইয়া আছে—শেমিজের উপর ধপ্‌ধপে থান কাপড় পরা, দিব্যি গিন্নিবান্নীর মতো সুস্থির চেহারা। ইটিকে আগে সে দেখে নাই; অনুমান করিল, বোধ হয় কাল কি পরশু নিযুক্তা হইয়াছে।

নন্দকিশোর আসনের সম্মুখে সহসা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, ঝিয়ের দিকে তাকাইল, যেন, জানিতে চায়, এ-আয়োজন কি তাহারই জন্য ?

ঝি বলিল, বসুন। তারপর যেন অকারণেই বলিল, মা ঠাকৃরুন ঐ পর্দ্দার ওদিকেই আছেন।—অর্থাৎ তিনিও তার আহারের তদ্বির করিতে অন্তরালে হাজির আছেন। কেবল ঝিয়ের উপর ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত নন্।

নন্দকিশোর ভারি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল—একটা ষড়যন্ত্রের আভাস যেন পাওয়া যাইতেছে…

কিন্তু তা' নয়—

সে আসনে বসিয়া ভাতে হাত দিতেই ঝি বলিল,—আপনি রান্নাঘরে খেতেন; বাবু বলছেন, আপনাকে রান্নাঘরে যেন বসানো না হয়—আপনি সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে।

ঝিয়ের মুখে শুদ্ধ ভাষা শুনিয়া নন্দকিশোর বিস্মিত হইল, বলিল, কিন্তু রান্নাঘরই আমার পক্ষে কাছে হয়।

ঝি মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, দূরে খেতে আপনার আপত্তিটা কি?

নন্দকিশোর চট্‌পট উত্তর দিল,—পরিশ্রম বেশি—অনর্থক কতকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয়।

কর্ত্তা ও কর্ত্রীর সঙ্গে অবাধে কথা বলিতে তার যে সংকোচ আছে, ঝিয়ের সঙ্গে কথা বলিতে তা' তার নাই। তার উপর তার আহার আর আপ্যায়নের জন্য এই সুসজ্জিত আয়োজন তার ভালো লাগে নাই।

ঝি বলিয়াছিল, কর্ত্রী পর্দ্দার ওদিকেই আছেন। কথাটা সত্য। নিঃশব্দে খাইতে খাইতে সে হঠাৎ তাঁহারই কণ্ঠঝঙ্কার শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; শুনিল কর্ত্রী বলিতেছেন,—আপনি দু'দিন অনুপস্থিত থাকায় ছেলের পড়ার ক্ষতি হয়েছে। আর, বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিত থাকলে মাইনে কাটা যায়, তা' কি জানেন না?

নন্দকিশোর আবারও মনে মনে হাসিল, কথা কহিল না। বেতন কর্ত্তন সম্বন্ধে সে নির্ভয়; তার উপর তার মনে হইল, এমনি করিয়া ভৎর্সনার সুরে কথা বলা এ-গৃহের গৃহিনীর রঙ্গ-প্রিয়তারই অন্তর্গত, কিংবা রূপগৌরবের একটা ভঙ্গী; এবং গা সির্‌সির্ করিয়া তার আরো মনে হইল, তার ফিরিয়া আসা সার্থক হইয়াছে; উনি রূঢ় স্বরে কথা কহিতেছেন, আর, ভারি তারল্যের সহিত মৃদু মৃদু হাসিতেছেন…

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর আবারও শুনা গেল; তিনি বলিলেন, কথা না বললে, লোকে গোবেচারা মনে করতে পারে; কিন্তু তা'তে মাইনে কাটা বন্ধ থাকে না। কিন্তু আবার এলেন যে বড়ো?

রক্ত তোলপাড় করিয়া একটি উত্তর নন্দকিশোরের জিহ্বাগ্রে নাচিয়া উঠিল, "তোমাকে দেখতে…"

কিন্তু নন্দকিশোর পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দই রহিল—

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন,—শেষ কথা বল্‌ছি; শুনে রাখুন আমার হুকুম। নির্ব্বোধের মতো অমন করে আর কখনো পালাবেন না।…পালিয়ে গিয়ে ফিরে আসায় কি মনে হচ্ছে জানেন? যে কারণে আপনি পালিয়েছিলেন, দিন দুই বাড়ীতে থেকে ভেবে চিন্তে দেখে তা'তে রাজি হয়েছেন। গৃহশিক্ষকের অত আপন খেয়ালে চলা ঠিক নয়।

তিনি চুপ করিতেই নন্দকিশোরের হুঁস হইল যে, এত কথার উত্তরে একটি কথাও না বলা বোধ হয় ন্যাকামি হইতেছে; সুতরাং সে রা কাড়িল, বলিল, যে আজ্ঞে।

তারপর আর কোনো কথা কেহই কহিল না, নন্দকিশোর মাঝখানে হরেরামের জিজ্ঞাসার উত্তর কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইল, ভাত এবং ব্যঞ্জনাদি কোনটিই 'সে আর চায় না। আহার শেষ করিয়া সে নামিয়া গেল, কিন্তু দর্পণে একটি প্রতিবিম্ব যেদিন সে দেখিয়াছিল সেদিনকার মতো অজ্ঞানাবস্থায় শূন্যপথে হুড়মুড় করিয়া নয়, অত্যন্ত ধীরপদে, সজ্ঞানে, কঠিন পদার্থের উপর পা ফেলিয়া আর, আনন্দের উত্তাল তরঙ্গবেগ প্রশমিত করিতে করিতে।

হরেরামের রাঁধা ভাত নন্দকিশোরের আজ ভারি ভালো লাগিয়াছে—আজ সে প্রকৃতই তৃপ্ত।...একটি উদ্গার তুলিয়া নন্দকিশোর তার চেয়ারে বসিল। বলরাম পান দিয়া গেল; পান চিবাইতে চিবাইতে নন্দকিশোর ভাবিতে লাগিল, উনি যে বলিলেন : "পালিয়ে গিয়ে ফিরে আসায় কি মনে হ'চ্ছে জানেন? যে কারণে আপনি পালিয়ে ছিলেন, দিন দুই বাড়ীতে থেকে ভেবে চিন্তে দেখে তাতে রাজি হয়েছেন।"... ইহাতে কি বুঝায়?—প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়া নন্দকিশোর অত্যন্ত পুলকিতচিত্তে নিজেরই সঙ্গে ছলনা শুরু করিয়া দিল, প্রশ্নের উত্তরটিকে এড়াইয়া এড়াইয়া মনের কাছে তাহাকে পৌঁছিতেই দিল না...ইহাতে যা বুঝায় তা' বুঝিয়া ফেলিলেই যেন অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর একটা স্বাদ নষ্ট হইয়া যাইবে।

তারপর নন্দকিশোর তাঁর মুখশ্রী মনে করিতে যাইয়া মনে করিতে পারিল না—প্রাণপণে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াও পারিল না—একটা কুজ্ঝটিকার অভ্যন্তরে যেন তার সমগ্রতা ঢাকা পড়িয়া গেছে···কেবল একটা প্রস্ফুটিত অপরূপত্বের অনুভূতি আছে—সংবিৎ সেই দিকে চুম্বক-শলাকার মতো স্থির হইয়া থাকিতে পারে—আবেগে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপেও কিন্তু ধারণা করিবার বস্তুর সন্ধান পায় না—অনন্যগতি মন তাহাতে সরসও হয়, জ্বালাও সহে···

অতিশয় চঞ্চল কয়েকটি মুহূর্ত ঝলকিত করিয়া চক্ষু বিদ্যুৎ বিদ্ধ করিয়া, আর জীবনস্থানে জ্বলন্ত একটি রেখা টানিয়া দিয়া, রূপরাশি অন্তর্হিত হইয়াছিল—যেমন বিস্ময়ের অন্ত পাওয়া যায় নাই, তেমনি তাহাকে ছুঁইতে পারাও যায় নাই। তখন নন্দ-কিশোরের অবজ্ঞার সঙ্গে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল মমতার তুলনায় তাঁহাকে অস্বাভাবিক আর ভয়ানক মনে হইয়া—এখন তার যন্ত্রণার সঙ্গে ক্ষোভ জন্মিল, অঙ্গুলির ভিতর ফুলের মতো মানস জুটে তাঁহাকে ধরিতে না পাইয়া ..

আহারে বসাইয়া যখন এত কথা কহিলেন, আর, এতই যখন আকর্ষণ, তখন পর্দ্দাটা একটুখানি দক্ষিণে কম সরাইয়া ধরিলেও ত পারিতেন!—দেখিতাম। . নন্দকিশোর মুখখানা ভার করিয়া রহিল।

তন্দ্রাকর্ষণ হওয়ায় নন্দকিশোর চেয়ার ত্যাগ করিয়া তার তক্তাপোষে গেল; তিনটা বালিশ পর পর সাজাইয়া তার উপর মাথা রাখিয়া শুইল—তারপর ঘুমাইয়া পড়িল...

ঘুম ভাঙ্গিবার পর যখন আলস্য দেহে আছেই তখন নন্দ-কিশোর সবিস্ময়ে দেখিল, বলরাম ঢুঁ মারিয়া পর্দ্দা সরাইয়া ঘরের ভিতর মাথা ঢুকাইয়া দিয়াছে—পরক্ষণেই তার সমগ্র দেহ প্রবেশ করিল—তার এক হাতে চায়ের পেয়ালা. অন্য হাতে খাবারের ডিস্! ঐ সব লইয়া বলরাম তাহারই কাছে গেল...

নন্দকিশোর জানিতে চাহিল, এ-সব কি?

দাঁত মেলিয়া বলরাম বলিল,—মা পাঠিয়ে দিলেন; বাবু

বলেছেন দিতে। বলিয়া নন্দকিশোরের সম্মুখে তার জলযোগ নামাইয়া দিল।

—চাত' আমি খাইনে! —নন্দকিশোর আপত্তি করিল।

—আমি ত' বলেছিলাম; বলেছিলাম যে, মাষ্টার মশায় চা খান্ না। তা'তে মা আমার ওপর বিষম খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌লেন; বল্‌লেন, তুই নিয়ে যা খাবেন; খেতে তাঁকে হবে, আমার হুকুম। ...তাঁর হুঁকুমে নিয়ে এলাম, তাঁর হুকুমেই খেতে হবে— খান্।

—রাখো, খাই। বলিয়া নন্দকিশোর হুকুমজারির চোট্ দেখিয়া সামান্ত একটু হাসিল; জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কোথায়?

বলরাম বলিল, ন'টায় খেয়ে বেরিয়ে গেছেন—টাঁকশালে সভা করতে গেছেন।

—টাঁকশালে?

—না, না, টাঁকশালে নয়; ব্যা—ব্যা—ব্যা...

নন্দকিশোর শেষ করিয়া দিল ব্যাঙ্কে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেখানেই বটে!

—একটু জল চাই যে!

—আনি।

বলরাম জল দিয়া চলিয়া গেল—নন্দকিশোর চোখে মুখে জল দিয়া খাবার খাইল; তার পর তাঁর হুকুমে চা খাইতে বসিল...

প্রথম যেদিন সে 'আমার হুকুম' শুনিয়া "তটস্থ" হইয়াছিল

সেদিন যা মনে হয় নাই আজ চা খাইতে খাইতে সেইটাই তার মনে হইতে লাগিল...

মণীন্দ্র তাহাকে যে খণ্ডকাব্য শুনাইয়াছেন তাহা সত্য নিশ্চয়ই ; সে-হিসাবে তাহাকে নষ্ট করিবার অধিকার ওঁর যেন নাই। তারপর তার মনে হইল, হয়তো ঐ কথাটা বলা তাঁর মুদ্রাদোষ ; সেবকগণকে হুকুমের উপর রাখিয়া হুকুম জাহির করা মজ্জাগত অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেছে ; পাত্রা পাত্র হিসাব বড় করেন, অসম্মান করার উদ্দেশ্যও বোধ হয় থাকে না ; তবে, শ্রুতিকটু বাক্য উচ্চারণ না করাই ভালো...

তারপরই, চা-পান শেষ হইবার বহু পূর্ব্বেই নন্দকিশোরের ভুল আপনিই ভাঙ্গিল—মানুষকে হুকুম করার দর্প যদি দুনিয়ার কাউকে সাজে তবে একমাত্র তাঁকেই···রূপের পশ্চাতে পৃথিবী ছুটিয়াছে, রূপের ইঙ্গিতে ত্রিলোক চালিত হইতেছে··· তিনি যে রূপরাজেন্দ্রাণী! সিংহাসনে বসাইয়া পায়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের কথাটা ভুলিলে চলিবে কেন!

নন্দকিশোর পরম পরিতুষ্ট হইয়া চায়ের কাপ নামাইয়া রাখিল।

বলরাম পান লইয়া আসিল—

তারপর আসিল রাখাল—

রাখালকে সঙ্গে লইয়া নন্দকিশোর বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল...

অন্যায় কার্য্য কত প্রকার এবং মূর্খ কত প্রকার,

বেড়াইতে বেড়াইতে নন্দকিশোর ছাত্রকে তা' বুঝাইয়া দিল। পরের গাছের ফুলটি, পরের দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ ইত্যাদি তেমনি অন্যায় কার্য্য যেমন অন্যায় কার্য্য হইতেছে পরীক্ষার সময় অন্যের লেখা নকল করা। মূর্খের সম্বন্ধে বলিল যে, মূর্খ একশত প্রকারের ত' আছেই—সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সম্ভবতঃ তার বেশিই পাওয়া যাইবে···

রাখাল বিস্মিত হইয়া বলিল, এত ?

—হ্যাঁ, এতই।

বলুন না, মাষ্টার মশায়, কি কি রকম!

—অত বল্‌তে পারবোনা—দু'টো একটা বলি।

মাসিকপত্রে পড়া বৃত্তান্ত সামান্যই নন্দকিশোরের মনে ছিল; বলিল; ভেবোনা যে মূর্খ যাকে বলা হয় সে সব-বিষয়েই মূর্খ—একেবারেই অকেজো গর্দ্দভ—তা' কিন্তু নয়। বল্‌লেই বুঝবে, যথাঃ নীরসে গুণবিক্রয়ী; দুঃখে দর্শিত দৈন্যার্ত্তিঃ; স্বাস্থ্যে বৈদক্রিয়ান্বেষী; লোভেন স্বজনত্যাগী; রোগী পথ্যপরাঙ্‌মুখঃ;—আর শুন্‌বে ?

—শুন্‌ব।

—বুঝলে কিছু ?

রাখাল অনুনয় করিয়া বলিল,—বুঝিয়ে দিন্, মাষ্টার মশায়···

—দেব ক্রমশঃ। স্বল্পে ভোজ্যেতইতিরসিকঃ; শ্লাঘায়েঃ স্বল্পভোজনঃ; মর্ম্মভেদী স্মিতোক্তিভিঃ; বাচা মিত্রবিরাগকৃৎ; রাজ্যার্থীগণকস্যোক্তেঃ; নৃপানুকারী মানেন; মন্যমান্ ভোজন-

ক্ষণে; লাভকালে কলহকৃৎ লোকোক্তৌ ক্লিষ্টসংবৃতঃ ; পুত্রাধীনে ন দীনঃ...

অনেক চেষ্টায় মনে করিয়া করিয়া নন্দকিশোর মূর্খ কাহাকে বলে তাহারই ঐ নির্ঘণ্ট দিল ; তারপর পুনরায় মনে করিয়া করিয়া বেকুবির ধাত আর ভাবগতিক বাঙ্‌লা ভাষায় বুঝাইয়া দিতে লাগিল...

এবং তাহাতে সন্ধ্যা লাগিয়া আসিল—ফিরিবার হইল।

সন্ধ্যার পরই বেড়াইয়া ফিরিয়া রাখাল গেল 'উপরে'—মূর্খদের চিনিয়া ফেলিয়া সে ভারি আনন্দ পাইয়াছে...

এবং সেই মূর্খ-তত্ত্বেরই খানিক্ রস লইয়া নন্দকিশোর তার ঘরের চৌকাঠ পার হইল, আর, তখনই মূর্খ-তত্ত্বের আমোদ তাকে ভুলিতে হইল ; নন্দকিশোর চৌকাঠের কাছেই থম্‌কিয়া রহিল···এ কি তাজ্জব! এ কোথায় আসিলাম ; এ যে ইন্দ্রপুরী!

ইন্দ্রপুরী বলিলে অবশ্যই বর্ণনায় অতিশয়োক্তি দোষ ঘটে ; তবে ইহা সত্যই যে, আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ঘরটিকে চমৎকার সুখপ্রদ আর সুশোভিত করা হইয়াছে—চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নন্দকিশোর দেখিতে লাগিল, আর-একখানা চেয়ার, নূতন চেয়ার, এবং আর-একখানা টেবিল, নূতন টেবিল,

আনা হইয়াছে—টেবিলের উপর রাখা আছে 'হ্যারিকেন' নয়, সুবৃহৎ আর অত্যুজ্জ্বল একটা টেবিল ল্যাম্প্—তার আলো কি!—কাজেই, হীনাবস্থ আর অনভ্যস্ত নন্দকিশোরের মনে হইল, সে যেন ঠিক্ ইন্দ্রপুরীতেই প্রবেশ করিয়াছে।

অবাক্ হইয়া নন্দকিশোর দাঁড়াইয়া আছে এমন সময় দেখা দিল বলরাম; একগাল হাসিয়া বলরাম বলিল,—দেখ্ছেন কি, বাবু, আপনার ভালো হ'য়ে যাবে—

—তার মানে?

—আপ্নি বাবুর নেকনজরে পড়ে' গেছেন। এ-সব বাবুর হুকুমেই হ'চ্ছে। একটুখানি এদিক্ ওদিক্ হ'লেই বাবু অনর্থ করবেন বলেছেন—

—কা'কে বলেছেন?

—আমাকে আর ঠাকুরকে। মাকেও বোধ হয় কিছু বলেছেন; তিনিও খুব শ—শ—শ... কথাটা বল্তে পার্লাম না— খুবই ব্যস্ত আর কি!

—শশব্যস্ত?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শশব্যস্ত।

—তা' ই নাকি?

—তবে বল্ছি কি! ইস্...

—কি হ'ল?

—ভাগ্যিস্ মনে পড়েছে! বলিয়া বিস্মৃত মারাত্মক বিষয়ের উদ্দেশে বলরাম শশব্যস্তে প্রস্থান করিল।

রাখাল পড়িতে আসিল—

তাহাকে পড়ানো শেষ হইল—সমুজ্জ্বল আলোকাধারের সম্মুখে বসিয়া পাঠনে নন্দর মন বসিল বেশি।

একা একা বসিয়া নন্দকিশোর একটু আন্‌মনা হইয়া রহিল; ভাবিতে লাগিল, "হ'ল ভালো"...

সুদৃশ্য আরামপ্রদ আবাসস্থানটির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া তার মনে হইতে লাগিল, তাহাকে অন্য কলেবরে রূপান্তরিত, আর, অত্যন্ত সংশোধিত করিবার ইচ্ছাই বুঝি মণীন্দ্রবাবুর! বাবু তাহাকে নিরুপদ্রবে রাখিবেন এবং বাবু তাহার ভালো করিবেনই—তিনি বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন—বলরাম বোধ হয় ঠিকই বলিয়াছে··

বলরামেরই উচ্চকণ্ঠ পর্দ্দার বাহিরে শুনা গেল; বলরাম বলিতেছে—"হুঁশিয়ার ঠাকুর"...

তারপরই দেখা গেল, বলরাম পর্দ্দাটা একাধারে অনেকটা টানিয়া ধরিয়া আছে, এবং ঠাকুর গা বাঁচাইয়া প্রবেশ করিতেছে; তার একহাতে সোপকরণ একথালা ফুল্‌কো লুচি, আর, অপর হাতে বড় একটা বাটি...

ভোজ্য সম্ভারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নন্দকিশোর বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া গেল; বলিল,—এখানে যে? আর, এ-সব কি!

ঠাকুর টেবিলের উপর থালা আর বাটি অত্যন্ত সাবধানে নামাইয়া দিল; নন্দকিশোরের প্রশ্নের জবাব দিল বলরাম; বলিল,—বাবুর হুকুম। বললাম কি তখন! নেক নজরে পড়ে' গেছেন।

নন্দকিশোরের মুখখানা গম্ভীর এবং মনটা সেই অনুপাতে

ভারি হইয়া উঠিল : এ-সব তার সংযম আর ত্যাগের সম্মান না আর সম্বর্দ্ধনা, আর মণীন্দ্রের সুখের স্বীকৃতি ; পুরস্কার অকপট এবং অজস্র—কিন্তু সে ত' মনে মনে চরম বিশ্বাসঘাতক আর অকৃতজ্ঞ···

মনের গুপ্ত গুহাশয়ী গভীর কলঙ্কযুক্ত একটা ভাষাবিন্যাস সহসা প্রবল হইয়া তাহারই সম্মুখে যেন উঠিয়া দাঁড়াইল—লজ্জার অবধি রহিল না···

এখন কেবল রূপদর্শন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা তার অভিলাষ নয় ; তার আরো অধঃপতন ঘটিয়াছে—সে আরো চায়···

কিন্তু, "দৈন্যে বিস্মৃতভোজনঃ" অর্থাৎ শোক বা তাপ পাইয়া যিনি আহারের কথা বিস্মৃত হন্ তাঁহাকে মূর্খ বলিতে পারা যায়।

সুধী নন্দকিশোরের প্রাণে আত্মগ্লানির দহন চলিতে লাগিল, এবং সে লুচি ছিঁড়িয়া মুখে দিতে লাগিল—মন এবং হাত যুগপৎ নিযুক্ত থাকিতে পারিবে না কেন !

তা-ই আছে বলিয়া নন্দকিশোরের গ্লানি মিথ্যা নয়—

মণীন্দ্রের মন অশুচি হইলেও হৃদয় প্রশস্ত ; তাঁর মন দিয়া দরকার নাই—তাঁর অভ্যাস দস্তুর ইত্যাদি এবং যা' কিছু দোষাবহ বিচ্যুতি তাঁর আছে, সবই অবান্তর—দ্রষ্টব্য যা, তা এই যে, তাঁর নিরহঙ্কার উদার হৃদয় হইতে প্রচুর দান নির্গত হইয়া তাহাকে, বলিতে গেলে, অর্চ্চনাই করিতেছে ; এমন কি, চরিত্রগৌরবে তাহাকেই শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি বলিয়া

স্বীকার করিয়া তিনি তাহারই সম্মুখে নিজেকে খর্ব্ব করিয়া দেখিয়াছেন। অসাধারণ মহত্ত্ব না থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না।···কিন্তু সে এমনই পাপাত্মা যে, এমন উৎকৃষ্ট ব্যক্তির অন্নদাতার প্রতিপালকের, একটি সাধের আর সুখের বস্তু অপহরণ করিবার প্রবৃত্তি আর উদ্যম লইয়া বসিয়া আছে—

নারীর রূপ আর দেহ এমনই কি অপার দুর্লঙ্ঘ্য জিনিস যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া কামনা আর জ্ঞান অপর কোথাও আনন্দের সন্ধান পাইবে না! মনুষ্যত্বের বিনিময়ে, ধর্ম্মকে নাকচ করিয়া দিয়া, আর চোখ বুজিয়া সমুদয় অন্তর-সম্পদ্ ধরণীর ধুলায় নিক্ষেপ করিয়া তাহা, সেই নক্শাকাটা কাচখণ্ড, পাইতেই হইবে!

এই ধরণে আরো খানিক্ ধিক্কারমূলক চিন্তা, এবং জাগতিক নশ্বর ঘৃণিত ব্যাপার সমুদয় বিশ্লেষণ, অর্থাৎ কুকর্ম্মকে অশ্রদ্ধা আর সৎকর্ম্মকে সাধুবাদ দিয়া, অনুতপ্ত নন্দকিশোর একটা জগদতীত নিষ্কাম অবস্থায় উপনীত হইল; দিব্যদৃষ্টি লাভ, বিবেককে ঠাণ্ডা, এবং আহার শেষ করিল···

মানুষের জন্মাবচ্ছিন্ন সত্য মধুময় সুখ আর নিত্য অনাবিল শান্তি দুরভিসন্ধের লালনে নহে, দুশ্চেষ্টায় মত্ত হওয়ায় নহে, দুষ্প্রবৃত্তির পোষণে নহে, ইহার ঠিক্ উল্টা দিকে—এ-কথা যিনি মানুষকে শুনাইয়াছেন তিনি ধন্যবাদার্হ···

ঐ উক্তির মহামতি কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিয়া নন্দকিশোর

আরো উপকৃত আর শুদ্ধ হইল—আরো কি হইত বলা যায় না; কিন্তু বলরাম আসিয়া দাঁড়াইল—নন্দকিশোরের আহার শেষ হইয়াছে দেখিয়া তার হাতে পান দিল; জিজ্ঞাসা করিল, পানে চুন খয়ের ঠিক্ হয় ত', বাবু?

—হয়।

না হলে বাবুকে যেন বল্‌বেন না—তৎক্ষণাৎ আমাকে বাবু তাড়িয়ে দিবেন।

নন্দকিশোর জিজ্ঞাসা করিল, বাবু এসেছেন?

বাবুর তাল্লাশ লইতে নন্দকিশোরের আজ এখন একটা নূতন রকমে ভাল লাগিল।

বলরাম বলিল,—উঁ হুঁ। ফিরতে রাত কতো হবে ঠিক্ নাই, বারটাও হ'তে পারে, বলে' গেছেন—বলিয়া বলরাম থালা বাটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

নন্দকিশোর আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল।

আহারাদির পর বাতি নিবাইয়া শুইয়া পড়িতেই যখন দেখা যায়, নিজস্ব চিন্তার ফলে চিত্ত উত্তেজনাহীন আর বিক্ষোভশূন্য হইয়াছে—শান্তি অগাধ, আর গ্লানিশূন্য অন্তর যে কতো নির্ভীক আর কতো মধুর তাহা উপলব্ধি হইতেছে, তখন প্রবাসী বিবাহিত ব্যক্তি চিন্তা করিতে থাকে, ভবিষ্যৎ নয়, চাকুরি নয়, স্বাস্থ্য নয়, অর্থ নয়, কোনো দৃশ্য নয়,

পুরাতন প্রসঙ্গ নয় স্ত্রীকে।…তদবস্থ নন্দকিশোর সেই 'নয়মের অধীনে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল মমতাকে; তার সম্বন্ধে একেবারে সার আর শেষ কথাটাই সে চিন্তা করিতে লাগিল "অমনটি আর হয় না—সুশীতল আর সুশোভনা"। যেদিক্ হইতেই বিচার করো, ঐ একই উত্তর "অমনটি আর হয় না—সুশীতল আর সুশোভনা"।

সুশীতল আর সুশোভনা মমতার হৃদয়-মাধুর্য্য তাহাকে বিভোর করিয়া রাখিল বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টা—

তারপরই হঠাৎ একসময় দুরু দুরু বুকে অস্থির আর প্রাণপণে উৎকর্ণ হইয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল—পর্দ্দার দিকে চক্ষু নির্নিমেষ হইয়া রহিল, এবং ইতঃপূর্ব্বেকার নিষ্কণ্টক পরিশুদ্ধ সমুন্নত আর প্রসাদসম্পন্ন চিন্তা কল্লোলিত আর মহাবেগে মথিত হইতে লাগিল…

এমন স্নায়ুৎপাটক বিপ্লব ঘটাইয়াছে, আর কিছু নয়, একটুখানি শব্দ; নন্দকিশোরের কানে একটা শব্দ আসিয়াছে, সিন্দুক বা কপাট ভাঙ্গার শব্দ নয়, পদশব্দ—কে যেন সিঁড়িতে মৃদু মৃদু শব্দ করিয়া পা ফেলিতেছে, অর্থাৎ অবতরণ করিতেছে…

চট্ করিয়াই নন্দকিশোরের মনে হইল, তিনি আসিতেছেন—আর কেহ নয়, আর কিছু নয়, তাহারই মনের প্রতিধ্বনি নয়, অর্থাৎ ভ্রম নয়, তিনিই আসিতেছেন—দুর্নিবার হইয়া এ-প্রত্যয় তার তৎক্ষণাৎই জন্মিল। উর্ব্বশী, চির-যৌবনা উর্ব্বশী, জগতের মনোমন্দিরবাসিনী চিরবাঞ্ছিতা

অনুপমা উর্ব্বশী, অভিসারে নির্গত হইয়া দেবরাজের শয়নমন্দিরে আসিতেছেন...সকল প্রেরণার যা' মূল, সকল চৈতন্যের যা, ব্যঞ্জনা, সকল প্রাপ্তির যা' শ্রেষ্ঠ সকল বস্তুর যা' নির্য্যাস আর সকল সম্পদের যা; শিরোমণি সেই অনন্ত রূপসম্ভার লইয়া তিনি আসিতেছেন—ঐ সতর্ক পদ-শব্দ তাঁরই—উৎক্ষিপ্ত আত্মা মূর্চ্ছাহত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবে...

রাখাল তার পর্দ্দার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, স্যার্ কি ঘুমিয়েছেন ?

নন্দকিশোর শুইয়া পড়িল, সে তখন হাঁপাইতেছে—কণ্ঠস্বর একটু বিলম্বে ফুটিল ; বলিল, না, কেন ? তার-পরই জিজ্ঞাসা করিল, চোরের মতো অমন আস্তে আস্তে এলে যে ?

রাখাল আস্তে আসার কারণ যা' বলিল ত' ন্যায্য ; বলিল, মা বলে' দিলেন যে আস্তে আস্তে নাম্‌তে ! বল্‌লেন, মাষ্টার মশায় বিশ্রাম কর্‌ছেন, দুপ্ দাপ্ করে' নামিস্‌নে, শব্দ ক'রলে তিনি বিরক্ত হবেন।

শুনিয়া নন্দকিশোরের জীবনে বীতস্পৃহা ধরিয়া গেল,—কি বল্‌তে এসেছ বলো।

রাখাল বলিল,—মা বল্‌লেন, ঠাকুর আর বলরাম কোথায় যাত্রা শুন্‌তে যাবে, ছুটি নিয়েছে। তারা বেরিয়ে গেলে সদর দরজাটা বন্ধ করে' দেবেন। আর, বাবা এসে ডাক্‌লে খুলে' দিবেন। 'কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।

কিছু মনে না করার ভান করিয়া নন্দকিশোর বলিল,—না, না, পাগল !

—তারপর দরজার ছিট্‌কিনিটা লাগিয়ে দেবেন। চোরের অসাধ্য কাজ নেই। বলিয়া রাখাল চলিয়া গেল।

নন্দকিশোরের মনে হইল, নাঃ, ভারি কঠিন বস্তু পাওয়াও কঠিন, ত্যাগ করাও কঠিন। কিন্তু আমি একটা কি ! যেমন নির্ব্বোধ তেম্‌নি নারকী আমি—পাপিষ্ঠ একটা। এত সঙ্কল্প সাধু চিন্তা পদশব্দেই চূর্ণ হইয়া গেল ! অথচ এখন সবে 'সন্ধ্যারাত্রি' কিন্তু আর না।

কিন্তু 'আর না' বলিয়া নিজেকে তিরস্কার আর দু'চারবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেই অদৃশ্য হইবে এ-দুশ্‌মন তেমন অশক্ত ছায়ারূপী নহে—এ আগে পাঠায় দুর্ব্বার ঝঞ্ঝা ! সংসার নিঃশব্দে তোলপাড় করিয়া এ সাড়া দেয় 'আর না' বলিয়া মুক্তি অন্বেষণ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই তা' পাওয়া দুষ্কর।

একটা বেদনা অনুভব করিয়া অতিশয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও নন্দকিশোর ভাবিতে লাগিল, সে আহত হইয়াছে...

এই আঘাত বিষমুক্ত করিতে পারে মমতা কাজেই নন্দকিশোর বিশল্যকরণী মমতাকে মনের গভীর আলিঙ্গনের ভিতর টানিয়া আনিল, আর ধরিয়া রাখিল...

বিবাহিত জীবনই শ্রেয়ঃ, যেমন মঙ্গলপ্রদ নিরাপদ, তেম্‌নি ধর্ম্মাচরণের অনুকূল।

মূর্ত্তিমান্ প্রতিকূল দশার মতো বলরাম আসিয়া জানাইল,—বাবু, আমরা চল্‌লাম।

নন্দকিশোর উঠিল তাহারা বাহির হইয়া গেলে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল...তারপর বাবু আসিলে যাইয়া খুলিয়া দিল।

মণীন্দ্র ক্লান্ত ছিলেন—

নন্দকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন কোন কথা কহিলেন না।

বিস্কিট এবং জেলি চায়ের সঙ্গে খাইয়া নন্দকিশোর সকালবেলা রাত্রিব্যাপী উপবাস ভঙ্গ করিল।

রাখাল পড়িতে আসিল—

এবং তারপরই দেখা দিলেন মণীন্দ্রবাবু—বলিলেন,—মাষ্টার, ভারি ব্যস্ত হে আমি। যার নাম ল্যাঠা তারই নাম ঠ্যালা। কাল রাত্রে যখন আমি বাড়ী ঢুক্‌লাম তখন চোখ বুজে' আছি—এত ক্লান্ত! কমন্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ বুঝি টেঁসে যায়! আমি আবার তার একজন হর্ত্তাকর্ত্তা লোক—দায়িত্ব নিয়ে বসে' আছি। গণেশ যা'তে উল্‌টে' না পড়েন, চেষ্টাচরিত্তির করে' তা'-ই করতে হ'চ্ছে। আচ্ছা, পড়াও। পড়্‌ছে ত' মন দিয়ে?

—মন দিয়েই পড়্‌ছে।

—অমনোযোগ দেখ্‌লেই চাব্‌কাবে—আমার বলা রইলো।

নন্দ সামান্য একটু হাসিল।

—আমি যাই। মাথার ভেতর সর্ব্বদা যেন ব্যাঙ্কটাই ঘুরছে। কা'ল রাত্রে অযথা পুলিশ স্বপ্ন দেখেছি। তোমার অসুবিধে হ'চ্ছে না ত' কিছু ?

—আজ্ঞে, না।

—হ'লেই বল্‌বে একটুও ইতস্ততঃ ক'রবে না। তুমিও এই বাড়ীরই লোক, যেমন আমরা। ঠাকুর চাকর যেমন আমাদের তেম্‌ন তোমারও। আচ্ছা, যাই। শুন্‌লাম, তুমি খাও খুব কম। খুব খাবে পেটের খোল চুপ্‌সে' গেলেই মলে'। আচ্ছা, পড়াও। বাড়ীর চিঠি পেয়েছ ?

—এখনও সময় হয়নি' পাওয়ার।

—ভালই আছে সবাই। আজ কি বার ?

—বৃহস্পতিবার।

—শনিবারে বাড়ী যে'ও।

ব্যস্তভাবে অনেক কথা বলিয়া মণীন্দ্র ব্যস্তভাবেই চলিয়া গেলেন। নন্দকিশোরের মনটা বড় ছল্‌ ছল্‌ করিতে লাগিল। বড় ভাল লোক, ভারি সুন্দর, অন্তঃকরণ খুব উচ্চ, সুবিবেচক, স্নেহপরায়ণ। ইঁহাকে ক্ষুদ্র মনে করা তার ভুল হইয়াছিল। ইঁহার আশাভঙ্গের কারণ হইয়া যদি ইঁহাকে সে মনঃকষ্ট দেয় তবে তা' অমানুষিক হইবে, অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে, পাপের পরাকাষ্ঠা হইবে।

মণীন্দ্রের কথা সে অনেকক্ষণ ভাবিল। কিন্তু এই বিকার পরবশ নন্দকিশোর নগণ্য প্রাণ পুত্তলিকাটিকে লইয়া

বিধাতার পরীক্ষামূলক কৌতুকের, আর মানুষের কৌতুকমূলক ক্রীড়ার, অর্থাৎ লোফালুফির, যেন অন্তই নাই।

যথাসময়ে নন্দকিশোর স্নান করিল—বলরামের আহ্বানে উপরে গেল; দেখিল, আয়োজন কল্যকার মতই এবং সেই শুভ্রবসনা স্ত্রীলোকটি, বোধ হয় তার আহারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়া, অদূরে দাঁড়াইয়া আছে...

নন্দকিশোর আসনে বসিল, কা'ল সংকোচবোধ হইয়াছিল, আজ তা' হইল না, মণীন্দ্রবাবুর অধিকতর হৃদ্যতা আর ভদ্রতার তার হৃদয় উন্মোজিত হইয়া গেছে, তার মনে হইয়াছে, ভদ্রলোক হিসাবে সে ইহাদের সমতুল্য, খাতির আর যত্ন তার প্রাপ্য।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরের রান্না আপনার ভাল লাগে ত' ?

নন্দকিশোর বলিল, ঠাকুর মন্দ রাঁধে না ত'।

—আপনি জাত মানেন ? ছোট বড়, হাতে খাওয়া যায়, যায় না, এম্‌নি বিচার আপনি করেন ?

—আগে কর্‌তাম, এখন কেওই করে না দেখে' আমিও করিনে।

—এ-কালের শৌখিন ঝি কি না; কথাবার্ত্তা গা-যেথা মতো! বলিল, ভালই করেন।—তারপর হঠাৎ সে জানিতে চাহিল,—বলুন ত' আমি এ বাড়ীর কে ?

নন্দকিশোর ইহাকে ঝি মনে করিয়াছিল; কিন্তু তার অনুমানটা কি তা' জিজ্ঞাসা করিতেই কথার সুরেই নন্দ-

কিশোরের মনে হইল, তার অনুমান মিথ্যা। বলিল, তা' জানিনে।

—আমি এ বাড়ীর কুটুম।

শুনিয়া নন্দকিশোর মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইল কৌতূহলবশতঃ নহে, এ-বাড়ীর কুটুম্বিনীকে সম্ভ্রম দেখাইতে; এমনি ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাইয়াও নির্ব্বিকার থাকিলে মানুষকে অগ্রাহ্যের ভাব দেখানো হয় নন্দকিশোর তা' জানে। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া সে দেখিতে পাইল, তাঁহাকে তিনি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁর মুখমণ্ডলে যে আভিজাত্যের ছাপ আছে তাহাও নন্দকিশোর এখন হৃদয়ঙ্গম করিল। এই পরিচ্ছন্ন মহিলাটিকে এ-বাড়ীর দাসী মনে করা ভুলই হইয়াছিল। দৃষ্টিশক্তির অভাবের দরুণ নন্দকিশোর নিজের কাছে লজ্জিত হইল।

ঠাকুর তল্লাশ লইতে আসিল, ভাত তরকারী প্রভৃতি কোনোটি বাবু আর চাহেন কি না; চাহেন না শুনিয়া সে চলিয়া গেল।

তারপর মহিলাটি বলিলেন,—আমি কাছেই একটা বাড়ীতে থাকি। বিপদে-আপদে ডেকে পাঠালে যাবেন। আমি একা মানুষ।

একা মানুষ বিপদে-আপদে কত অসহায়, নন্দকিশোর তা' বোধ করিল, খুশীর সঙ্গে সম্মত হইয়া বলিল,—নিশ্চয়ই যাবো, খবর পেলেই যাবো।

দেখা গেল, মহিলাটি স্নেহপ্রকাশ করিতে বেশ পারেন, প্রচুর আর পরম উপাদেয় বাৎসল্যের সহিত বলিলেন,—খুব সুখী হলাম শুনে। কিন্তু আপনি অত অল্প খান্ কেন। জোয়ান মানুষ আপ্নি—আপনাকে খাইয়ে লোকে পেরে' উঠ্বে না; তা' নয়, এ যেন পক্ষীর আহার!

কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর পক্ষীর আহার'ই সুস্থির চিত্তে গলাধঃকরণ করা নন্দকিশোরের বরাতে নাই; এমন সুন্দর স্নেহশীতল আব্হাওয়া সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া হৃদয়হীন বিধিবিড়ম্বনা শুরু হইয়া গেল সেই ক্ষণেই...অতিশয় মৃদু একটু সুঘ্রাণ কোথা' হইতে ভাসিয়া আসিয়া ছড়াইতে ছড়াইতে বৃহৎ দু'টি বন্ধু পাইয়া গেল নন্দকিশোরের নাসিকায়—সেখানে সেই ঘ্রাণ অবাধে প্রবেশ করিল...

গন্ধটা গন্ধতেলের; বকুলের গন্ধ, এবং কাহারো কেশপাশ হইতেই বাতাস এই সুবাস্য আহরণ করিয়াছে, আর বহন করিয়া আনিয়াছে ইহা নিশ্চয়...

সঙ্গে সঙ্গেই নন্দকিশোরের স্মৃতিপট প্রদীপ্ত হইয়া দুলিয়া উঠিল—তার মনের গাঙে ঢেউ উঠিল—তার সংবিৎ উজান দিকে প্রাহিত হইয়া দ্রুতবেগে সেই ঘ্রাণের স্রোত বহিয়া চলিয়া গেল আর একদিনের একটা দেখার মাঝে যেদিন সে সাবানের গন্ধের অনুসরণ করিয়া গিয়াছিল নিষিদ্ধ একটা দ্বারে—সেখানে সেদিন সে যাহা দেখিয়াছিল তাহা যেন এই মুহূর্ত্তে অধিকতর সমারোহে সমগ্রতা লাভ করিয়া আর অধিকতর স্ফুট ফুল্ল হইয়া তার পুরোভাগে জাগিয়া

উঠিল...সমস্ত স্নায়ু শিরা তাহার নর্ত্তনে আকর্ষণে থরথর্ করিতে লাগিল—একটা অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল...

নন্দকিশোর পর্দ্দার দিকে চোখ তুলিল, কি করিয়া তুলিল, আর, কেন তুলিল, তাহা জানে না, চোখে দেখিতে পাইল কি পাইল না তাহাও সে জানে না, কিন্তু মনে হইল দৃষ্টি নিঃশেষ হইয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যেন একটি চক্ষু, একটুখানি ললাট, এবং কেশের খানিক্ কৃষ্ণ আভ পর্দ্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেল—পর্দ্দাটা নড়িতেছে তা' স্পষ্টই চোখে পড়িল...

নন্দকিশোরের এ-হুঁশ্ থাকার অবস্থা নয় এবং রহিলও না যে একটি ব্যক্তি তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছে; কিন্তু তার হুঁশ্ হইল সেই ব্যক্তিরই কণ্ঠস্বর কানে যাইল; তিনি বলিলেন, এরই মধ্যে হঠাৎ আপনার হ'ল কি ? অসুস্থ বোধ কর্‌ছেন ?

নন্দকিশোরের আনত মুখ আকর্ণ আগুন হইয়া উঠিল; "না"।—বলিয়া হতচেতনের মত সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল—

কুটুম্বিনী সবিস্ময়ে জানিতে চাহিলেন—উঠে' পড়্‌লেন যে ?

প্রশ্নটা নন্দকিশোরের কানেও গেল না—কেবল সম্মুখের দিকে অস্পষ্ট 'দৃষ্টি মেলিয়া—সে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

ত্যাগ-ভোগের কোনোটাতেই নিজেকে রাজী করিতে না পারায় অর্থাৎ অচল ভূমির উপর দাঁড়াইবার একটা স্থান করিয়া লইতে না পারায়, নন্দকিশোরের নিজের উপর এত রাগ হইল যে তা' বলিবার নয়; সেই রাগে সে ঘরময় ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং নিজেকে যেন কশার আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিল···

তার মনে হইল, আবার পালাই।

এমন ঘোর সংকট আর বিভ্রমের মাঝেও নন্দর সৃষ্টিছাড়া ভাবে একটু হাসিই পাইল; সেবার পালাইয়াছিল আতঙ্ক তাড়িত হইয়া পরের কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে, এবার সে পলাইতে চায় দোটানায় বিপন্ন হইয়া নিজের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে। দু'টিতে কত প্রভেদ!

নন্দকিশোরের নাক দিয়া একটা অসহায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতিত হইল; পালানো হয় না; পুনরায় তার অর্থ দাঁড়াইবে বিশ্রী কদর্য্য—এমন বিশ্রী কদর্য্য যে, মণীন্দ্রবাবু উহাকে বোধ হয় আর আস্ত রাখিবেন না। অপরাধ যাইয়া পড়িবে তাঁহারই ঘাড়ে, পড়া অনিবার্য্য; কারণ, মণীন্দ্রবাবু তাহার দ্বারা স্বীকারোক্তি করাইয়া লইয়াছিল যে, অপরাধ নারীরই;... মণীন্দ্র একবার তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন—বোধ হয় পায়ে

ধরিয়া ভদ্রলোকের নিকট হইতে ক্ষমা আদায় করিয়া লইতে হইয়াছে—হয়তো বাক্যবাণে ক্লিষ্টা আর গলদশ্রুলোচনা হইয়া তিনি অনেক কাঁদিয়াছেন।

তাহারই প্রণয়াকাঙ্ক্ষার অপরাধে শাসিতা হইয়া সুন্দরী রমণী অশ্রুমুখী হইয়াছে, এই চিন্তা হঠাৎ ভারি মনোরম হইয়া উঠিল ; এবং তাহারই পাশে কাঁটার মতো খচ্ করিয়া বিঁধিল একটা ব্যথা—উনি লাঞ্ছিতা হইয়াছিলেন তাহারই নিন্দনীয় মানসিক দুর্ব্বলতার কারণে, তাহারই ভয়বিহ্বলতার জন্য। পলায়ন না করিয়াও সেই ব্যাপারটাকে পরিহার করা যাইত যাহাকে তখন অকারণেই দুঃসহ দুর্ব্বিপাক মনে হইয়াছিল, পলায়ন না করিয়া সোজাসুজি বলা যাইত যে, আপনি দয়া করিয়া আমাকে দেখা দিবেন না, এবং ও-হেন প্রস্তাব ভুলিয়াও করিবেন না—আমি উহা আদৌ পছন্দ করি না ; দ্বিতীয়তঃ আমি পেটের দায়ে এখানে আসিয়াছি, তাড়াইবেন না।···ঐ কথাগুলি স্পষ্ট বলিয়া দিলেই তিনি সাবধান হইতেন, উদ্ঘাটিত হইতেন না, লাঞ্ছনা বা শাসনের হেতুই দেখা দিত না।

তাঁহাকে ততোধিক এবং যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিতা হইতে হইবে যদি আবার তেম্নি পালাই—তাঁহাকে কেবল খোঁটার উপর রাখিয়া রাখিয়া মণীন্দ্র তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য দুস্তর কণ্টকশয্যায় তুলিয়া দিবেন। সর্ব্বনাশ।···যদি বলিয়া কহিয়া যাই তাহা হইলেও পরিণাম তাহাই ঘটিবে—মণীন্দ্র কদাচ [illegible]াকে রেহাই দিবেন না, জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিবেনই।

…নন্দকিশোরের প্রাণে ভারি করুণার উদ্রেক হইল, এবং তাহারই ঘোরে সে খানিক্ বিভোর হইয়া রহিল—

তারপর তার দেহ কণ্টকিত হইল ইহাই স্মরণ করিয়া যে, তিনি লুকাইয়া, সংসারের একেবারে অগোচরে, তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, খুব ভাল না লাগিলে, এবং খুব ভাল না বাসিলে, অর্থাৎ প্রাণসংশয়কর তৃষ্ণা অনুভব না করিলে কেহ অমন করিয়া লুকাইয়া দেখে না।…আজ পর্য্যন্ত তাহার মনে তাহারই যে জীবনেতিহাস গ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং পরে ক্রমশঃ গ্রথিত হইয়া থাকিবে, সেই ইতিহাসে এই ঘটনাটাই থাকিবে উজ্জ্বলতর গভীরতম মধুরতম আর স্মরণীয়তম হইয়া—জরা-মরণজয়ী হইয়া তাহার জীবন্ত সত্যটি স্থিতিলাভ করিবে—অলোকসামান্যা রূপসীর অতি দুর্লভ আর পরম কাম্য অনিরুদ্ধ তীব্র ভালবাসা।

ভালবাসা পাইয়া নন্দকিশোরের সশরীরে স্বর্গারোহণ ঘটিতে লাগিল—তার অর্থ এই যে, পরম উল্লাসকর প্রাপ্তির পুলকে তার অঙ্গ শিহরিত হইল, এবং তার জগৎ কুসুমিত হইল, এবং তার জগৎ প্লাবিত করিয়া পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতো সুনির্ম্মল ভালবাসা তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল

এই ব্যাপারে দীর্ঘশ্বাস খুব প্রাধান্য লাভ করে—

নন্দকিশোরেরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপ যৌবন অর্থাৎ নশ্বরত্ব, বাদ দিয়া নিরবয়ব এবং নিরুত্তেজক চিরঞ্জীবী ভালবাসার আবির্ভাব হইতেই তার মনে হইল, সেও বড়ো একা, এবং তিনিও তেম্নি তাহারই মতো বড়ই

একা ইস্ হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগবশতঃ অনুকম্পার দারুণ প্রকোপে নন্দকিশোরের মুখ দিয়া ঐ ক্লেশসূচক শব্দটি সশব্দেই নির্গত হইয়া গেল হইবারই কথা, কারণ মণীন্দ্রবাবুর এই গৃহে অধিষ্ঠীত যক্ষ এবং যক্ষাঙ্গনার মাঝে ব্যবধান অতি অল্প, এবং ব্যবধানে অতি অল্প আর এক-লাফেই পার হওয়া যায় বলিয়া, সঙ্কীর্ণ জলপ্রবাহের মিলন প্রয়াসী এপার ওপার দু'তীরের যন্ত্রণার মতো এই বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা সত্যই অপার

সামান্য বাধ্যতা পার হইয়া অপার যন্ত্রণা ঘুচানো যায় কি উপায়ে তাহা নন্দকিশোর চিন্তা করিত কি-না বলা যায় না, কারণ সেই সময়টিতেই পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল অবাঞ্ছিত বলরাম; বলিল,—ও, জেগেই আছেন! একবার দরজায় আসুন ত'।

—কেন?

—ডাক্‌ছেন আপনাকে। বলিয়া বলরাম দাঁত বাহির করিল...

ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া কে ডাকিতেছেন?

বলরামের দাঁত দেখিয়া বিরক্ত হইবার অবসর নন্দকিশোরের হইল না—চক্ষের নিমেষে সে লাফাইয়া উঠিল এবং চক্ষের নিমেষেই পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া দেখিল, 'এ-বাড়ীর কুটুম্ব' সেই মহিলাটি দাঁড়াইয়া আছেন—সৌজন্যজনিত প্রফুল্লতার মাঝে তাঁহাকে চমৎকার সৌম্য দেখাইতেছে...

মহিলাটি হাসিয়া বলিলেন,—আমি যাচ্ছি। ডেকে,

পাঠালে যাবেন; আলাপ করবো; যাবেন কিন্তু।

—যাব বই কি! বলিয়া নন্দকিশোর কৃতার্থ হইয়া রহি।

'কুটুম' চলিয়া গেলেন।

(৮)

সেইদিনই সন্ধ্যার পর আবার একটি প্রস্থান ঘটিল।

মণীন্দ্রবাবু ঢুকিয়া পড়িলেন; বলিলেন,—এই আস্‌ছি হে। ওপরে যাইনি' এখনো। কমন্‌ ব্যাঙ্ক্‌ লিমিটেড্‌ বোধ হয় টিঁকে গেল। আজ রাত্রেই এলাহাবাদ যাচ্ছি। আরো কয়েকজন যাবেন, ঐ ব্যাঙ্কের কাজেই। বেশি কথা বলার সময় নেই। তুমি রক্ষক হ'য়ে থাক্‌লে। খুব সাবধানে থেক'। কবে ফির্‌বো জানিনে। তুমি ভক্ষক নও তা' জানি। নিমক্‌হারাম লোককে দেখ্‌লেই আমি চিন্‌তে পারি।...কিন্তু, আর-একটা কঠিন কথাঃ শনিবারে তোমার বাড়ী যাওয়া হ'ল না। শাপ্‌বে না ত'? ও-শাপ বড় লাগে। বুড়ো বাল্মীকি নাকি কেঁদে ফেলে ব্যাধ বেটাকে শেপেছিল!

নন্দকিশোর হাসিয়া ফেলিল—

—শাপ্‌লে ত' বয়ে গেল। আচ্ছা, চলি। খেয়েই ছুট্‌তে হবে। আর পারিনে। আচ্ছা —বলিয়া মণীন্দ্র প্রস্থানোদ্যত হইতেই নন্দকিশোর দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিল; মণীন্দ্র প্রতিনমস্কার করিলেন না; বলিলেন,—ব্যহ্যাচারের

ধার ধারিনে ; আমার সম্বন্ধে তুমিও ধেরো না। বুঝলে মাষ্টার, ও কেবল কাজ বাড়ানো। আচ্ছা, যাই। এসে যেন দেখিনে তুমি আবার পালিয়েছ।

শুনিয়া নন্দকিশোর হঠাৎ অধোবদন হইল—মণীন্দ্র চলিয়া গেলেন।

মণীন্দ্রের শেষ কথা ক'টির ভিতর বেদনা ছিল—নন্দকিশোরকে তা' আঘাত করিল।

কুটুম্বিনী চলিয়া গেছেন নিকটবর্ত্তী নিজের বাড়ীতে এবং মণীন্দ্রবাবু চলিয়া গেলেন বহু-দূরবর্ত্তী এলাহাবাদে—গৃহ প্রহরীহীন, অভিভাবকহীন, যতটা বাঞ্ছনীয় ততটা জনশূন্য হইয়া গেল এবং পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এমন একটা স্থানে দাঁড়াইয়া গেল যেখানে বাস করায় নন্দকিশোরের পক্ষে সুখ আছে···স্থান যত নির্জ্জন প্রাণি-হীন তত প্রাণহীন এ-কথা সব সময়েই সত্য নহে—সত্য যে নহে তাহার প্রমাণ আজ এই বাড়ীটা। নন্দকিশোর মর্ম্মে মজ্জায় চৈতন্যে এই নির্জ্জনতার গভীর সঙ্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল ; তার মনে হইতে লাগিল, এই বাড়ীর বায়ু স্বেচ্ছাবিহারী অবাধ প্রাণে পূর্ণ হইয়া গেছে—তাহার প্রাণে এবং তাঁহার প্রাণে পরিপূর্ণ হইয়া বায়ু নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত, বক্ষঃস্পন্দনে তরঙ্গিত, প্রতীক্ষার আবেগে কম্পমান্

আর বেদনায় আতুর হইয়া উঠিয়াছে—আর, পক্ষশরের অলক্ষ্য দ্যুতিতে মুহুর্মুহু তাহার ভিতর যেন ফুলের প্রাণ ফুটিয়া ফুটিয়া মিলাইয়া যাইতেছে...

ঐরূপ চঞ্চল কিন্তু উত্তম আবহাওয়ায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে নন্দকিশোর হঠাৎ জ্ঞানসঞ্চয়ে মন দিল; কিন্তু আধুনিক বঙ্গ-ভাষার অভিধান 'চলন্তিকা' তার চিত্তের আক্ষেপ এবং বিক্ষোভ কতটা নিবারণ করিল তাহা সে-ই জানে এবং দ্রুতহস্তে পাতার পর পাতা উল্‌টাইয়া কতগুলি শব্দের অর্থ সে চক্ষুগোচর করিল তাহাও সেই জানে।

গৃহকর্ত্তা বাহিরে গেলেন; তিনি রওনা হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীর সবারই একটু ব্যস্ততা ছিল; কাছে নন্দকিশোরের লুচি আসিতে আজ রাত্রি বেশি হইয়াই গেল, প্রায় দশটা...

লুচি খাইতে খাইতে নন্দকিশোর ভাবিতে লাগিল মণীন্দ্রবাবুর কথা...বাবু ভাগ্যবান্ বটে; অগাধ টাকা, কিন্তু টাকা যাক্ চুলোয়—অপরূপ নারীরত্ন তাঁর; সেই আনন্দেই প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতেছে। ঘটিবে না কেন! উদ্বেগহীন একাধিপত্য যে! অমরবাঞ্ছিত যে রসায়ন তিনি হৃদয়পুটে পাইয়াছেন তার ক্রিয়া অমোঘ—রূপসম্ভোগই মানুষের জীবনের উৎস এবং উৎসব, সুধাময় উপচার। ভালবাসা তিনি পান্ নাই, চাহেনও না বোধ হয়; কিন্তু অনিন্দ্য রূপের স্বর্গ হইতে ক্ষরিত অনাবিল মধুধারা তিনি অহরহ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিতেছেন।

বাসা গৌণ লক্ষ্য, জীবনের দ্বিতীয় ধারা; আদিভূত যে-রসের নাম ভোগসুখ তাহা তিনি অপর্য্যাপ্তই পাইয়াছেন এবং পাইতেছেন। গায়ে মাংস লাগিবে না কেন! রঙে জলুস দেখা দিবে না কেন! তাঁর প্রাণে রাসোৎসব এবং মুখে কথার স্রোত চলিবে না কেন!

আলো নিবাইয়া নন্দকিশোব শুইল—

টাকা এবং ভালবাসা যখন একই সার্থকতা দান করিতেছে তখন টাকার অভাবের দরুণ আপসোস্ কি আছে! যার টাকা অল্প তার কি সবই অল্প! তার আয়ু, তেজ, আশা, উদ্যম, শ্রী, স্বপ্ন প্রভৃতি, এবং সর্ব্বোপরি প্রণয়াকাঙ্ক্ষা আর তা'ই লাভ, এ-দু'টো অল্প না-ও হইতে পারে।

অর্থাল্পতার দুঃখ যা' মাঝে মাঝে দেখা দেয়, নন্দকিশোর তা' তখনকার মতো ভুলিল; কিন্তু কেবল অর্থাল্পতার দুঃখ ভুলাইয়া দিবে, আজকার এই পরিবেশ সে-রকম স্থূল, লৌকিক, এবং নিরীহ নহে।

তারপরই পুলকে নন্দকিশোরের অঙ্গ অবয়ব যেন মনের অনুসরণ করিয়া অন্তরীক্ষের দিকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল...

এই শয্যা আজ ধন্য হইবে, ইহা সত্য। সুষুপ্তা নিশীথিনী আজ যৌবনসহ যৌবনের, রূপের সঙ্গে রূপের, আর, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলনোল্লাস আপন বক্ষে চিহ্নিত অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

কেন এরূপ অবশ্যই ঘটিবে, প্রতিবন্ধক দেখা দিবে না,

নন্দকিশোর নিশ্চয়ই তা' বলিতে পারিবে না ; কিন্তু তার চৈতন্যে এই বিশ্বাস পুঞ্জীভূত হইল, রক্তে তাহা সঞ্চারিত হইল, আর মস্তিষ্ক ব্যাপিয়া তাহা ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।··· দৈবী কাণ্ড নিশ্চয়ই—বিপদ যেমন ছায়াময় পূর্ব্বাভাষ নিক্ষেপ করে, সুখ-সম্পদ্ও তেমনি বোধ হয় কল্লোলময়ী অলকনন্দার আলোক আর তরঙ্গ প্রেরণ করে···

কতক্ষণ নন্দকিশোর ভাবাবিষ্ট, আনন্দে আত্মহারা, আর, আসার আশায়, মগ্ন ছিল, কে জানে—কাছেই কোথাও হঠাৎ একটা গুরুভার দ্রব্যপতনের শব্দে সে ভয়ানক চম্‌কিয়া উঠিল—

কঠিন চম্‌কানি ; যে—কথাটা আস্তে বলিলেই চলিত, চম্‌কিত নন্দর মুখ দিয়া সেই কথাটাই যেন আর্ত্তনাদের মতো বাহির হইল ; নন্দকিশোর জানিতে চাহিল—কে ?

উত্তর আসিল, আজ্ঞে আমি, বলরাম।

—শব্দ হ'ল কিসের ?

—আজ্ঞে, খাটিয়া ফেল্‌লাম।

—কোথায় ?

—সিঁড়ির মুখ আর আপনার দরজার মধ্যেখানে।

—কেন ?

—বাবু বলে গেছেন পই পই করে'। চোরের ভয় তাঁর বেজায়।—বলিয়া বলরাম শব্দ করিয়া হাসিল, বলিল,—বাবু বল্‌লেন তোরা আসার পথ পাবিনে, কিন্তু চোরগুলো ঠিক পাবে। সেইটাই ওদের বাহাদুরী। সিঁড়ির দোতলার

দরজায় ডবল্ তালা লাগিয়ে এসেছি। ভূমিকম্প হ'লে কিন্তু মুশ্‌কিল।—বলিয়া বলরাম আবার শব্দ করিয়া হাসিল।

ইহকালীন ধ্বংসজনক দুর্ঘটনা কেবল ভূমিকম্পই নয়। উপস্থিত দুর্ঘটনার প্রথম ধাক্কাটা নন্দকিশোর শুইয়া শুইয়াই সাম্‌লাইল; তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই, সে দুর্ব্বলদেহ রুগীর মত কষ্টে সৃষ্টে উঠিয়া বসিল নিষ্পলক চক্ষে যেদিকে সে তাকাইয়া রহিল সেদিক্‌টা অন্ধকার—কেবল আলোকশূন্য বলিয়াঅন্ধকার নয়, নিষ্প্রাণ বলিয়াও অন্ধকার, আরও অধিকতর সূচীভেদ্য। অসাড় প্রাণে অন্ধকারটা সে দেখিল, এবং তারপরই সংবিৎ উৎক্ষিপ্ত করিয়া, জন্মিল নয়, জ্বলিয়া উঠিল প্রচণ্ড ক্রোধ, মণীন্দ্রের বিরুদ্ধে···নন্দকিশোরের সেই ক্রোধ মণীন্দ্রের উপর নিপতিত হইলে তিনি বাঁচিতেন না।

মণীন্দ্র তখন গাড়ীর ভিতর—

কলিকাতার প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রিটের সন্নিকটবর্ত্তী একটা স্থান হইতে প্রয়াগযাত্রার একটি হাতে-মুখে-খড়িচূর্ণ মাখা সঙ্গিনী সংগ্রহ করিয়া লইয়া তিনি গাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীর কাম্‌রায় বসিয়া আছেন, এবং তাহাকে, সেই সঙ্গিনীকে, মিসেস্ রায় বলিয়া সম্বোধন করিয়া বিস্তর আনন্দ করিতেছেন এবং সহযাত্রী বন্ধুত্রয়ের বিস্তর আনন্দের কারণ হইতেছেন···

কাজেই নন্দকিশোরের ক্রোধের শিবতাণ্ডব আর যন্ত্রণা চলিতে লাগিল কেবল তাহারই বুকে, এবং আগুনের মূর্ত্তি ধরিয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল তাহারই মস্তিষ্কে...

—বলরাম?

বলরাম ঘুমায় নাই, সাড়া দিল, আজ্ঞে।

—বাবু ফির্‌বেন কবে?

উত্তর চাহিয়া নন্দকিশোর অনর্থক ঐ প্রশ্ন করিল। বাবু ফিরিলে সে কি করিবে তাহা সে ভাবেই নাই।

বলরাম বলিল, সঠিক্ কিছু বলে' যান্ নাই, বাবু।

নন্দকিশোরের একটি নিঃশ্বাস পড়িল—এ-নিঃশ্বাসটি মামুলী নিঃশ্বাস নয়; তার এই নিঃশ্বাসটি আভিসম্পাতেরই প্রকারন্তর। নন্দকিশোর তাহার এই সর্ব্বনাশ কর নিঃশ্বাসটিকে মণীন্দ্রের অদৃষ্টকে লক্ষ্য করিয়া তাঁর পশ্চাতে ছুটাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল…

লোকটা, ঐ মণীন্দ্র, অতিশয় দুশ্চরিত্র, ক্রুর, অতিশয় নির্লজ্জ, অতিশয় অভদ্র, এবং আরো বহু ন্যক্কারজনক দোষের আধার। ঐ লোকটি তাহারই, একটি ভদ্রলোকের, স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া তাহারই সম্মুখে যেরূপভাবে লোলুপতা এবং দুঃসাহস প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে মনুষ্যপদবাচ্য কোনো ব্যক্তিরই কোনো কারণেই তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা অনুচিত, এমন কি অসম্ভবই! বলিহারি যাই সেই ধৃষ্টতার।… সেই অমানুষের অসাধ্য দুষ্কার্য্য কি আছে!

নন্দকিশোর পূর্ব্বে যাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সেই জিনিসটা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিল। মণীন্দ্র বলিয়াছিলেন ঘরে যার যুবতী স্ত্রী আছে তার সুখের অংশ মনে মনে আমি গ্রহণ করি।…শুনিয়া তখন সে অবাক হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু

এখন নন্দকিশোরের জ্ঞান হইয়াছে যে তা' পারা যায়।.. বর্ত্তমানে তার যত আক্রোশ মণীন্দ্রের প্রতি, নিজের প্রতি নয় নন্দকিশোরের পুনঃপুনঃ মনে হইতে লাগিল, অত্যন্ত লম্পট জঘন্য ব্যক্তি না হইলে পরস্ত্রী-সম্বন্ধে মানুষের অত আসক্তি থাকে না—মণীন্দ্র তা'-ই; এবং সেই কারণেই তিনি তাহার মাহিনা বাড়াইয়া দিয়া রাত্রে লুচির ব্যবস্থা করিয়া দিলেও তিনি ঘৃণ্য। তিনি নিজেই অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে নিজের স্বরূপ অনাবৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নারী সম্পর্কে তিনি খুব হ্যাংলা। ভদ্রলোকে তা' কখনো পুত্রের বয়সী গৃহশিক্ষকের সম্মুখে মুখ ফুটিয়া বলে নাকি! তাঁর বাহাদুরির আর-কিছু নাই। গৃহশিক্ষক বলিয়া সে যেন মানুষই নয়! অত্যাচারী, ভণ্ড কুৎসিত...

মণীন্দ্রকে গালি পাড়িয়া নন্দকিশোর খানিক যেন বেহুঁশ হইয়া রহিল...

তারপর তার কলিজা ক্ষতবিক্ষত আর পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল অন্য কারণে—এবার দোষী সে নিজে...

তাহার জন্যেই প্রমোদিত অতুলন এক রাসমঞ্চ রচিত হইয়াছিল—ভাগ্যশ্রী হাসিমুখে তার মুখের দিকে নেত্রপাত করিয়াছিলেন—পাত্র পূর্ণ করিয়া সুধা লইয়া তাহারই উদ্দেশে যাত্রা একজন করিয়াছিল; কিন্তু সে নিজে অন্ধ মূঢ় ভীরু—অনন্ত রূপ আর যৌবন দূরে ঠেলিয়া দিয়া সে পরিত্রাহী ডাক ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল ঠিক পাগলের মতো...

তিনি বলিয়াছিলেন, আপনি নির্ব্বোধ, তা'ই দিশে পান্না পালান্।

আতিথ্যগ্রহণ এবং আনন্দদানের জন্য ভোগস্বর্গে আর প্রেম বৈকুণ্ঠে অমৃতময় এই অবারিত আমন্ত্রণের অনিবার্য্যতা আর দুর্লভতা সে অনুভবই করিতে পারে নাই, এমনই সে দৃষ্টিহীন, অসাড়, ক্লীব...

আজকার এই শাস্তি তারই কর্ম্মফল, তার প্রাপ্য। সে পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া মণীন্দ্র তার কারণ একটা অনুমান করিয়াছিলেন; এবং অনুমান করিয়াছিল ঠিকই—ঘটনায় সত্যতা সে স্বীকারও করিয়াছিল, তা'ই তাহা কেই নিরাপদে রাখিবার জন্য মণীন্দ্রের সতর্কতার সীমা নাই

...দুলজ্ঘ্য প্রতিবন্ধক স্থাপন তার বিরুদ্ধে নয় তাঁরই তথা-কথিত প্রণায়িণীর বিরুদ্ধে। তার ক্রুদ্ধ হইবার কারণ কি আছে। নিজের পায়ে এমন করিয়া কুঠারাঘাত আর কেহ কখনো করে নাই নন্দকিশোরের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বুকে কুঠার মারিয়া নিজের ভবলীলা সে এখনই সাঙ্গ করিয়া দেয় নিষ্ফল অস্তিত্ব, আর, অনুতাপপূর্ণ অতৃপ্ত জীবন বহন করিয়া কাজ কি। অযোগ্য কাপুরুষের মৃত্যুই মঙ্গল।

স্বহস্তের কুঠারাঘাতে নিজের ত্বরিত মৃত্যু কামনা করিয়া নন্দকিশোর একটা শাস্তি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র শান্তি পাইল না কারণ, তাহার সঙ্গে আর একজন জড়িত ও সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। চক্রবাক নিজেকে বাদ দিয়া চক্রবাককে চিন্তা করিতে পারে, কিন্তু চক্রবাকী বাদ দিয়া নিজের চিন্তা করিতে পারে না; শত্রু অথবা অদৃষ্ট ব্যাঘাত আর বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে,

কিন্তু ব্যবচ্ছেদ করা তার সাধ্যতীত—প্রেম যেখানে প্রাণে প্রাণে মিলিত করিয়াছে সেখানকার নিয়মই তা'ই!

নন্দকিশোর মানসচক্ষে একটি চিত্র দেখিতে লাগিল, যাহার তুল্য জীবন্ত, আর করুণ সংসারে আর কিছু নাই কাতরা বিপন্না নারি ক্রন্দনবেগ নিরোধ করিয়া ক্লান্তি আর অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন—নিদ্রার নামগন্ধ ও তাঁর চোখে নাই, জলে তা' ধুইয়া গেছে ' লক্ষ্মীছাড়া যমপুরীর অন্ধকারে বন্দিনী বিপন্না নারীর হিয়া কেবলি মথিত হইতেছে, গুম্‌রাইতেছে—তাঁর কম্পিত সঘন নিঃশ্বাসের সাথে তার প্রাণের বেগ আর দেহের সুষমা নিঃসৃত হইয়া যাইতেছে কখনো স্পন্দন কখনো শৈত্য সেই দেহে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে—রক্ত মাংসে নির্ম্মিত সেই কুসুম কোমল দেহ আর সহিতে পারিতেছে না•••

যে ব্যক্তি ইহার হেতু এই দুর্ভোগে যে মূল, পারিজাতের বুকে যে শেল হানিয়াছে, সংসারের মর্ম্মস্থলে সে নির্ঘাত আঘাত করিয়াছে—সেই দুর্ব্বৃত্ত দানবকে সংসার ক্ষমা করিবে না।

সংসার সেই দুর্ব্বৃত্ত দানবকে ক্ষমা না করিলে অকল্যাণ সমূহ দশদশার কোন্‌টী সেই দানবকে পীড়িত করিবে তাহা ভাবিবার দরকার বোধ হয় নাই; নন্দকিশোর সংসারের সুবিধার জন্য তা' বাছিয়া দিল না। কিন্তু আশ্চর্য্য হইল ইহাই ভাবিয়া যে, সে পীড়িত হইতেছে সংসারের কোন্ বদ্ খেয়ালে!

কিন্তু তাহার চাইতেও আশ্চর্য্য ঘটনা ইহাই যে, দু'চোখ ভাঙ্গিয়া নন্দকিশোর ঘুম পাইতে লাগিল—বাহিরে বলরামের নাকে কাঁকর পিষিয়া রথ চলিতেছে ভিতরে সে তার রক্ত আর মন

ফুটিতেছে, মগজে লাগিয়াছে আগুন। তবু তার ঘুম পাইল।

সকালবেলা নন্দকিশোরের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বলরাম তার তুস্তর খাটিয়া লইয়া চলিয়া গেছে এবং তখন নন্দকিশোরের প্রাণে যে তিল মাত্র সুখ নাই—মনে এমন বিতৃষ্ণা আর আলস্য যে, পৃথিবীর দিকে তাকাইতেছে ইচ্ছা করিতেছে না...

ষড়রিপুর একটিও যখন প্রতাপশালী নহে, তখনও মনে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঘোর তিক্ততা দেখা দিতে পারে। বলরাম যখন চা ইত্যাদি লইয়া আসিল তখন তাহার দিকে চাহিয়া নন্দকিশোর তিক্ততা অনুভব করিল এবং রাখাল যখন পড়িতে আসিল তখন তাহার দিকে সেই তিক্ততা আরো বাড়িয়া গেল

বেগার ঠেলার মতো সে পড়াইয়া গেল—রাখালের পাঠ-বিষয়ক প্রশ্নের জবাব সে আর দিল।

পড়িতে পড়িতে রাখাল হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—বাড়ীর চিঠি পেয়েছেন ?

—না, কেন ?

মা জান্‌তে চেয়েছেন।

সমস্ত তিক্ততা অরুচি ডুবাইয়া অপূর্ব্ব মধুর রস তৎক্ষণাৎ উথলিয়া উঠিল : নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করা ছাড়া এ জিজ্ঞাসার আর কোনো অর্থই নাই ; তার মুখ হইতে একটি জবাব লইয়া তাহাকেই তার দেহ আর মনকে, তিনি নিজের

কাছে স্থান দিতে চান্—মনে মনে একটু স্পর্শ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর…

নন্দকিশোরের স্বর গদগদ হইয়া উঠিল; বলিল,—তাঁকে বলো' যে চিঠি পাইনি'। আর-কিছু বলেছেন?

—বলেছেন।

—কি বলেছেন? নন্দকিশোর উত্তরটা শুনিবার জন্য ঘাড় বাড়াইয়া দিল।

—রাত্রে একা একা ভয়ে তাঁর ঘুম হয় নাই।

শুনিয়া নন্দকিশোর ভাবে মশগুল হইয়া গেল—'একা একা' শব্দ দু'টি প্রচুর অর্থ বহন করিতেছে—পার্শ্বে মণীন্দ্রের অভাব নিশ্চয়ই কঠোর হইয়া ওঠে নাই।

বলিল,—ঘুম আমারও হয় নাই। প্রায় সারারাতই জেগে ছিলাম।

তাঁর ঘুম হয় নাই—

তারও ঘুম হয় নাই—

নন্দকিশোরের বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল যেন—একবার বেদনায় মুচ্ড়াইয়া উঠিতে লাগিল, একবার আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল এবং রাত্রিব্যাপী তার সর্ব্ব প্রকার অভিজ্ঞতা নূতন রকমের স্বাদসংযুক্ত, আর সুষ্ঠু, হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল; সর্ব্বোপরি আশার সঞ্চার এত হইল যে, স্বল্পপরিসর মাটির জগতে তাহার রাখিবার ঠাঁই না পাইয়া নন্দকিশোর চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যানের অনন্ত লোকে তাহা ছাড়িয়া দিল আর ছড়াইয়া দিল…

গাঢ়স্বরে বলিল, ভয়ের কারণ কিছু নেই—তাঁকে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে বলো'। আমি আছি, ভয় কি!...কা'ল আমি জেগেই ছিলাম,' আজও থাক্‌ব'।—যথেষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে মনে করিয়া নন্দকিশোর খানিক্ যেন বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় নিঃশব্দ হইয়া রহিল।

পড়া শেষ করিয়া রাখাল উপরে গেল—

নীচে বসিয়া নন্দকিশোর হাঁটু নাচাইতে নাচাইতে কল্পনা করিতে লাগিল, রাখালের মুখে বাড়ীর চিঠির অনাবশ্যক খবর আর জানিয়া থাকার অত্যাবশ্যক খবর, দ্বিবিধ খবরই, তিনি শুনিতেছেন...রাখালের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া, এবং যাহার খবর শুনিতেছেন সেই আকিঞ্চনকে স্মরণ করিয়া, উৎফুল্লভাবে তিনি তার মুখের ভাষার আবৃত্তি দু'কান ভরিয়া শ্রবণ করিতেছেন···

কিন্তু উহাও তুচ্ছ—

সিঁড়িতে দুম্‌দাম্ শব্দ করিয়া রাখাল দ্রুতবেগে নামিয়া আসিল, দৌড়াইয়া ঘরে ঢুকিল; বলিল, মা বল্‌লে, জেগেই যেন থাকেন কখন্ কি ঘটে বলা যায় না। বলিয়াই রাখাল তেম্‌নি করিয়া চলিয়া গেল—

আর নন্দকিশোরের মনে হইতে লাগিল, সে ভূমিসাৎ হইতেছে, নিজেকে ধারণ করিতে সে অক্ষম, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, চন্দ্র, সূর্য্য স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, বসুন্ধরা দুলিতেছে, হৃদয়পিণ্ডের স্পন্দন আর রক্তের গতি স্থগিত হইয়া গেছে এবং তথাপি, হৃদ্‌পিণ্ডের আর রক্তের নিরুদ্ধ

অবস্থাতেই, তার তেজের অসাধ্য কার্য্য এখন কিছুই নাই…

জাগিয়া সে আছে এবং থাকিবে—গতিশীল কালের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত এবং তার নেত্রপল্লবের প্রতিটি নিমেষ তাহারই প্রতীক্ষমান সতর্ক জাগরণে উদ্ভিন্ন আর উন্মীলিত হইয়া আছে এবং থাকিবে…

তারপর নন্দকিশোর খুব অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। তেল মাখিতে বসিয়া তার তেলমাখা শেষ হয়ই না। শরীরের যে স্থানে একবার তেল দিয়াছে সেখানে সে আরো দু'তিনবার দিল; স্নান করিতে যাইয়াও ঠিক্ তেম্‌নি অন্যমনস্ক—গাত্র-মার্জ্জনা পুনঃপুনঃই করিতে লাগিল—গায়ে মাথায় জল ঢালিতে শুরু করিল ত' একযাই ঢালিতেই লাগিল।

আজও উপরেই আহারের ঠাঁই হইয়াছে। ঠাঁই হইয়াছে শুনিয়া সে উপরের উদ্দেশ্যে পা বাড়াইতেই তাহাকেই চমকিত করিয়া তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। খুব গম্ভীরভাবে সিঁড়ি ভাঙিয়া নন্দকিশোর উঠিয়া গেল—সিঁড়ি ভাঙিতে কষ্টবোধ করিল না; দেখিল, সমুদয় ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ এবং নির্দ্দোষ; পরিবর্ত্তন এইটুকু যে শ্রদ্ধেয়া সৌম্যমূর্ত্তি কুটুম্বিনীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দন্ত সর্ব্বদা অপরিষ্কার বলরাম…

প্রথম নজরে দেখা গেল বলরামকে; এবং দ্বিতীয় নজরে দেখা গেল যে, তার দক্ষিণ দিক্‌কার দরজায় যে-পর্দ্দা গা মেলিয়া দিয়া ঝুলিয়া থাকিত তাহাকে গুটাইয়া একপাশে

সরাইয়া রাখা হইয়াছে; ঘরের ভিতরটার অনেকখানি দেখা যাইতেছে, এবং আরো যা' দেখা যাইতেছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব গৌরব যথেষ্ট···এ-ঘরেও একখানা প্রকাণ্ড আয়না রহিয়াছে—দরজার দিকেই তার মুখ। নন্দকিশোরের স্মৃতি উদ্দীপিত হইল···

দর্পণে ছায়া পড়ে—এই আছে এই নাই, এম্‌নি ঘটে লক্ষ বার। কিন্তু ছায়ার নিকটে ছায়ার পতনে স্বাতন্ত্র্য আছে—সর্ব্বদাই তা' নিমিষের ব্যাপার নয়, নিমিষেই তার বিলুপ্তি ঘটে না—তা' অমর হইয়া থাকে স্মৃতিপটে—স্মৃতিপথ বহিয়া সে ছায়ার সঞ্চারণ চলিতেই থাকে···

কাজেই, দর্পণের দিকে চোখ পড়িতেই নন্দকিশোরের ক্ষুধার চাইতে চতুর্গুণ প্রবল হইয়া উঠিল স্মৃতি; এবং নন্দকিশোর মনে মনে নিজের গালে কয়েকটা চড় বসাইয়া দিল।···মুহূর্ত্তেক সেখানে সে দাঁড়ায় নাই—সদ্যঃধৌত অনাবৃত অতুলনীয় যৌবনব্যাপ্ত দেহ আর সর্ব্বাঙ্গের অবারিত সৌন্দর্য্য, তার ছায়া, পশ্চাতে ফেলিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল, যষ্টির ভয়ে সারমেয়ের মতো, আতঙ্কে অন্ধ হইয়া; কিন্তু সেই ক্ষতি আর অতৃপ্তি আজ বুঝি ঘুচিবে; সবারই অজ্ঞাতে ঐ দর্পণের অভ্যন্তরে তিনি দেখা দিবেন এবং দেখিবেন। সেই দর্পণের দিকেই নন্দকিশোর ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল—এই সহজ কথাটা তার মনেই রহিল না যে, তার এই আচরণ বলরামের অদ্ভুত এবং আপত্তিকর মনে হইতে পারে।

গৃহিণী কখন্ বলরামকে ইঙ্গিতে ডাকিয়াছেন তাহা নন্দকিশোর টের পায় নাই—হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া সে দেখিল, বলরাম ও-ঘরের পর্দ্দার কাছে দাঁড়াইয়া বোধ হয় কর্ত্রীর হুকুম শুনিতেছে...

সম্ভবতঃ উনি বলরামকে স্থানান্তরে পাঠাইতেছেন, সেদিন যেমন ঠাকুরকে মিছ্‌রি, যে-মিছ্‌রিতে মাছি বসে নাই সেই মিছ্‌রি আনিতে দোকানে পাঠাইয়াছিলেন--তারপর তাকে তাঁর মনের কথা বলিয়াছিলেন। সেদিনকার ঘটনার চরম পরিণতির সম্ভাবনায় নন্দকিশোরের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল—তিনি কি বলিবেন, আর সে কি বলিবে! যে-হাতে করিয়া নন্দকিশোর মুখে ভাত তুলিতেছিল তার সেই হাতটা কাঁপিতে লাগিল···

কিন্তু বলিতে বা শুনিতে হইল না কিছুই, এবং হাতের কাঁপুনি হইল অপ্রাসঙ্গিক; কারণ, ঘটনা ঘটিল এই মাত্র যে, বলরাম ওদিক্‌কার পর্দ্দার নিকট হইতে এই পর্দ্দার নিকটে আসিয়া গুটানো পর্দ্দা নন্দকিশোরের চোখের উপর সটান্ করিয়া মেলিয়া দিয়া তার জায়গায় যাইয়া দাঁড়াইল। নন্দকিশোরের মুখ লাল হইয়া উঠিল—তাহাকে যেন কেউ ইচ্ছাপূর্ব্বক সহসা অপ্রস্তুতে ফেলিয়াছে অপ্রস্তুতে পড়িয়া নন্দকিশোরের অল্প সময়ের জন্য অসন্তোষের উদ্রেক হইয়া একটু অশ্রদ্ধাই জন্মিল: বিবাহিতা স্ত্রী ত' নন্! শাসনের ভয়ে প্রেমাস্পদের সম্পর্কে পর্দ্দার অতো কড়াকাড়ি না করিলেও চলিত।

কিন্তু সব সত্যের উপর এই সত্যই প্রবল যে, আশা আর আয়োজন করে মানুষ, ব্যবস্থা আর চালনা করেন ভগবান্।

যেমন-তেমন করিয়া খাওয়া শেষ করিয়া নন্দকিশোর নামিয়া গেল অত্যন্ত অন্যমনস্কের মতো—পান হাতে লইয়া গালে দিতে তার ভুল হইয়া গেল, এবং গালে দেওয়া হইলই না, মমতার চিঠি আসিয়া তার হাতে পৌঁছিল—

মমতা লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু

কয়েক দিন যাবৎ পত্র লেখ নাই। কেমন আছ জানিবার জন্য আমরা বড় উতলা হইয়াছি, মা বড় ভাবিতেছেন। পোষ্টকার্ডে একখানা পত্র লিখিতে বেশী সময় লাগে না। সে সময়ও কি নাই? এত ব্যস্ত কোন্ কাজে জানি না। পত্রপাঠ তোমার সংবাদ দিবে।

আমরা ভালই আছি। ইতি

সেবিকা মমতা।

যথাবিহিত ভর্ৎসনা মমতার ঐ পত্রে ছিল—নন্দকিশোর পত্রের দিকে চাহিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া রহিল; কাজটা অন্যায়ই হইয়াছে—খবর না দেওয়া উচিত হয় নাই। মা উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, মমতাও করিতেছে। উহাদের সে সর্ব্বস্ব—মনে হইতেই নন্দকিশোরের কোমল অন্তঃকরণ কাহার উপর অভিমান করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল,

এবং কেন চোখে জল আসিল, তাহা সে জানে না।...তৎক্ষণাৎ সে ডাকঘরে ছুটিল; ডাকঘরে দাঁড়াইয়া পেন্‌সিলে পত্র লিখিল মাকে; লিখিল, সে ভালই আছে; পত্র না লেখার অপরাধ তিনি যেন মার্জ্জনা করেন; আর কোনদিন এরূপ ভুল হইবে না। পত্র পাইতে দু'একদিন দেরী হইলেও তাঁহারা যেন ভাবিত হইয়া কষ্ট না পান্। শরীর খারাপ হইলে সে অবশ্যই সংবাদ দিবে।

পত্র ডাকে দিয়াই নন্দকিশোরের মন হাল্‌কা হইয়া গেল; ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্যচ্যুতির অপরাধ এমন বাষ্পের মতো লঘু হইয়া গেল যে অনুভব করার উপযুক্ত অস্তিত্বই তার রহিল না।

নন্দকিশোর ঘুমের আয়োজন করিতে লাগিল—অচিরেই ঘুমাইল এবং তিনটার পর ঘুম ভাঙিয়া আলস্যবশতঃ খানিক বিছানাতেই সে বসিয়া রহিল—

চাকুরির চেষ্টা করা হইতেছে কই! কর্ত্তব্যকর্ম্মে এত অবহেলা ত ভাল নয়! ভবিষ্যৎ আছে। এখানকার পনর' টাকা আজ আছে কাল নাই, পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর মত; এটা ত' উপায় মাত্র, লক্ষ্য নয়। কিন্তু সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে...

যে-লক্ষ্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া উচিত ছিল, তাহাকে ত্যাগ করিয়া সে পলায়ন করিয়াছিল। মনস্তাপ সহিতে হইতেছে কত!...মণীন্দ্র তাহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া বন্দী করিয়াছেন, হত্যা করিতেই উদ্যত হইয়াছেন। তবু উভয়ের চেষ্টায় পথ পাওয়া যাইবেই।

এখানে আসিয়াছিল বলিয়াই ত...

ঠোঁট মুচ্ড়াইয়া নন্দ একটু হাসিল—হাসিটুকু মুখে লইয়াই সে ঘরের বাহির হইয়া কল-ঘরে মুখ ধুইতে গেল. যাতায়াতে কল-ঘরটা একটু দূরেই পড়ে—প্যাসেজের মোড় ঘুরিয়া সেখানে ঢুকিতে হয়—কিন্তু শব্দ ঢোকে সোজা পথে। নন্দও ঢুকিল, শব্দও উঠিল—সিঁড়িতে হিল-উঁচু জুতার অতি-পরিচিত খট্খট্ শব্দ; শব্দ দ্রুতবেগে নামিতেছে... নন্দকিশোর চম্কিয়া উঠিল—তার সর্ব্বাবয়ব শক্ত হইয়া উঠিল, মন হইল সূচ্যগ্রের মত তীক্ষ্ণ...একটা কিছু করিবার জন্য সে সচেষ্ট হইবার পূর্ব্বেই শব্দ মিলাইয়া গেল...

নন্দকিশোর ভাঙিয়া-চুরিয়া একেবারে বসিয়া পড়িল—একি নির্ম্মম দৈব! অদৃষ্টের প্রবঞ্চনা ইহার চাইতে সাংঘাতিক কেমন করিয়া হইতে পারে। দু'মিনিট্ পূর্ব্বে নয়, দু'মিনিট পরে নয়, ঠিক্ যে-সময়টিতে অনুপস্থিত থাকিলে সে দর্শনে বঞ্চিত হইবে, সেই সময়টি দেবতা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন—কি কৌশলে জানাইয়াছেন তাহা সেই দেবতাই বলিতে পারেন। বিধাতা সত্যই বাম। অভিমানে নন্দকিশোরের ভারি কান্না পাইতে লাগিল—পৃথিবী শুদ্ধ, বাসের অযোগ্য হইয়া গেল, এবং সে নিজে যে একজন পরম ভাগ্যহীন ব্যক্তি, তাহাও সে বিশ্বাস করিল...

আর, মুখ ধুইয়া আসিয়া দেখিল, তের-চৌদ্দ বছরের একটি সুখদর্শন কান্তিযুক্ত বালক তার দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে দেখিয়াই ছেলেটি পকেটে হাত

ভরিল; একখানা ক্ষুদ্রায়তন কাগজ বাহির করিয়া তার হাতে দিল—

—কি এ?

—চিঠি।

উৎসুক হইয়া নন্দকিশোর চিঠির ভাঁজ খুলিল এবং পড়িল:

"কল্যাণীয়েষু,

ডাকিয়া পাঠাইলেই আপনি আসিয়া দেখা করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। আজ ৫টা হইতে ৫৷৹টার মধ্যে আসিবেন। কথাবার্ত্তা কহিব। ইতি।"

নিম্নে ঠিকানা ও তারিখ দিয়াছেন, কিন্তু নাম বা এমন কোন পরিচয় দেন নাই যাহাতে সেই কুটুম্বিনীকে পত্র-লেখিকা মনে করা যায়।

'পুনশ্চ দিয়া' লিখিয়াছেন: "এই ছেলেটি ঐ সময়ে আমার দরজায় থাকিবে"।

নন্দকিশোর ছেলেটির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, আচ্ছা।

—নমস্কার। বলিয়া ছেলেটি কপালের কাছ বরাবর হাত তুলিয়া চলিয়া গেল, এবং, নন্দকিশোরের মনে হইতে লাগিল, ইহাকে কোথায় যেন সে দেখিয়াছে—ইহাকেই কিংবা অনুরূপ চেহারার কোন বালককে। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছে, গাড়ীতে না পথে না কারো বাড়ীতে তাহা মনে করিতে পারিল না। চোখ বুজিয়া নন্দকিশোর একটা স্থান-কাল হাতড়াইতেছে এমন সময় কণ্ঠস্বরে তার মনোযোগ আকর্ষণ করিল বলরাম: "এমন আর দেখি নাই!"

নন্দকিশোর ধীরে ধীরে চোখ খুলিয়া দেখিল, বলরাম স্বাভাবিকভাবে দাঁত মেলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—

জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল ?

—যা মুখে এল তা'ই বলে গেলেন, গাল দিলেন খুব।

—কে ?

—কত্তৃ।

—কেন ?

—বারান্দার রেলিং-এ শাদা কি লেগে' ছিল ; বল্‌লেন, তুই চূণ মুছেছিস্ এখানে। আমি বল্‌লাম, না। তিনি বল্‌লেন, মিছে কথা ফের যদি বল্‌বি তবে অপমান হবি। মুছে ফ্যাল্ এখুনি। কিন্তু সেই শাদা জিনিসটা কি তা' জানেন ?

—কি ?

—চড়ুয়ের গু।

—কিন্তু তিনি ত' বাড়ীতে নেই! বেরিয়ে গেলেন বলে মনে হ'ল।

—এখন নেই, তখন ছিলেন। আমি তখনকার কথাই বল্‌ছি।

—কোথায় গেলেন ?

- বাবুর খবর জান্‌তে, বাবুরই এক বন্ধুর বাড়ী—সে-বাবু এ-বাবুর সঙ্গেই গেছেন। সেখানে যদি খবর এসে থাকে মেয়েদের কাছে! বাবু ত' এখানে খবর দেন্ নাই!

—ও। বলিয়া নন্দকিশোর নিঃশব্দ হইয়া রহিল।

এঁর পরিচয় সেখানে অজ্ঞাত নাকি! ঝি-মেয়েদের কাছে খবর জানিতে গিয়াছেন সে মেয়েরা কেমন ঘরের?... এদিকে ত' বাবুর উপর টানও আছে দেখ্‌ছি!

বলরাম বলিল,—ঘুম পাচ্ছে। ঘরে ঘরে বড় বড় তালা লাগিয়েছেন—আমি লাগালাম সিঁড়ির দরজায়। গু তুল্‌তে ঝাড়া একটি ঘণ্টা লেগেছে। অনেক ছিল জায়গায় জায়গায়। সব তুলেছি। দেখুন দেখি মজা, দোষ করবে চড়ুই, আর গা'ল খাব আমি!

—আচ্ছা, এস। বলিয়া নন্দকিশোর মুখ ফিরাইয়া হাই তুলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(১)

কাঁটায় কাটায় সোয়া পাঁচটার সময় আহূত নন্দকিশোর সুসজ্জিত হইয়া স্নেহপূর্ণ আহ্বানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বাহির হইল।...তিনি যে-বাড়ীর 'কুটুম', নন্দকিশোর সেই বাড়ীরই প্রিয় গৃহশিক্ষক; তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করা কিংবা তাহাকে সহায় গণ্য করা কিছুই বিচিত্র নয়! সুতরাং নন্দকিশোর বাহির হইল।...আগে একদিন সে টেলিগ্রাম লইয়া বাবুর সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল সেই নিয়তির বশে যে-নিয়তির বশে খাদ্যান্বেষণে নির্গত ব্যাং লাফাইতে লাফাইতে গিয়া পড়ে সাপের একেবারে মুখে! আজ সে-রকম কোনো দুর্দ্দৈবের আশঙ্কা নাই...

নিঃশঙ্ক নন্দকিশোরের পত্রোক্ত ঠিকানায় পৌঁছিতে পথ ভুল হইল না, দেরীও হইল না; এবং সুস্থচিত্তে সেই নম্বরের দরজায় উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, কুটুম্বিনী কথা রাখিয়াছেন—সেই ছেলেটিকে দরজায় রাখিয়া দিয়াছেন।

"আসুন"। বলিয়া ব্যগ্রভাবে অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করিল, সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রসর হইল, নন্দকিশোর অসংকোচে তার অনুসরণ করিল, এবং কিছুতেই নিঃসন্দেহ হইতে

পারিল না, ইহাকে কিংবা ইহার প্রতিরূপ আগে সে দেখিয়াছে কি না…

নীচেকার যে ঘরটা দেখা যাইতেছে তাহাকে দুই দিকে বেষ্টন করিয়া প্রশস্ত দরদালান—সেই দরদালানের অপর প্রান্তে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি। ছেলেটি তাহাকে সিঁড়ির মুখে আনিয়া বলিল,—আপ্‌নি ওপরে উঠে যান্। সদর দরজা খোলা আছে, দিয়ে আসি।—বলিয়া সে ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল।

নন্দকিশোরের ব্যস্ততার কারণ নাই—

এ-বাড়ীতে আসা যেন তার ব্যক্তিগত অবিরোধী অধিকার—এমনই একটা অকম্পিত ভাব লইয়া নন্দকিশোর সিঁড়ি ভাঙিতে লাগিল—কষ্টবোধ করিল না। উপরে উঠিয়া সে বারান্দায় পা দিতেই দরজা ছাড়িয়া সেই মহিলাটি প্রফুল্ল মুখে তাহার দিকে আগাইয়া আসিলেন; সাগ্রহে বলিলেন,—আসুন, আজ কি ভাগ্যি আমার! আমি পথ চেয়ে ব স' ছিলাম…

কণ্ঠস্বরের অকপট কোমলতায় তাঁর স্নেহের স্পর্শ পাইয়া নন্দকিশোর মুগ্ধ হইয়া গেল; বলিল,—আমাকে আপ্‌নি বল্‌লে আমাকে খুব লজ্জা দে'য়া হয়।

—তুমিই বল্‌ব এখন থেকে। তোমাকে সত্যিই পর মনে করিনে ছেলের ওপর মায়ের যেমন তেম্‌নি তোমার ওপর আমার মমতা জন্মেছে।

তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ চোখের দিকে চাহিয়া নন্দকিশোর ভাবিতে লাগিল, এই অতুলনীয়া মাতৃমূর্ত্তির পদধূলি লইবে

কি না! মায়ের ত' জাতিবিচার নাই—সন্তানের কেন থাকিবে!...পদধূলি লইবার উদ্যম মনে হইলেও হাতের অবসর হইল না—যে হাতে পদধূলি লওয়ার নিয়ম তিনি তার সেই ডান হাতখানাই খপ্ করিয়া চাপিয়া ধরিবেন; বলিলেন, এস, বস্‌বে। বলিয়া তিনি নন্দকিশোরকে এক রকম টানিয়াই ঘরে লইয়া গেলেন...

হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, বসো' চেয়ারে।

কিন্তু বসিবার পূর্ব্বে নন্দকিশোর খুব অবাক্ হইয়া গেল—ঘরের আসবাব প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যের প্রশস্ততা আর উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য আর কারুকার্য্যের যেন অন্ত নাই... চেয়ার রহিয়াছে, টেবিল রহিয়াছে, আল্‌না রহিয়াছে, আয়না রহিয়াছে, পালঙ্ক রহিয়াছে—সবগুলিরই চাকচিক্য যেন চোখ ধাঁধাইয়া মুহুর্মুহু ঠিক্‌রাইয়া উঠিতেছে...কেবল শোয়া বসার আরামের জন্য টাকাকে টাকা জ্ঞান না করিয়া কাঠের উপর ঢালা হইতেছে!

কিন্তু সকলের চাইতে দ্রষ্টব্য ঐ পালঙ্ক—আড়ে-বহরে বিপুল ব্যাপার; আর তদুপরি বিস্তৃত শয্যা আরো দেখিবার মতো, যেন ফুলকাটা দুধের ফেনা ঢেউ খেলিতেছে!—বালিশ চাদর ওয়াড় এমনই বাহারের যে, আর গদি তোষোক এমনই পুরু যে, লাফাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে, শখ মিটাইতে একবারের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য...

লাফাইয়া নন্দকিশোর সে-বিছানায়' পড়িল না; বলিল,

আপনিও বসুন। বলিয়া সে চেয়ারে বসিল—তার শরীরের চাপে চেয়ারের গদি চার ইঞ্চি বসিয়া গেল।

—না বাবা, বস্‌ব' না এখন। সারাদিন এত বসে' থাকি যে, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থেকেই ভারি আরাম পাই। বলিয়া মহিলাটি দাঁড়াইয়া থাকার কারণ দেখাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নন্দকিশোর বলিল,—তা' বটে। এবং তারপরই সে দেখিল, তিনি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন; যেন একটা উৎকণ্ঠা লইয়া তাহার দিকে খানিক্ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া বিষণ্ণস্বরে বলিলেন,—একটা কথা বলি তোমাকে।...না, থাক, এখনই বল্‌ব' না। একটু মিষ্টি মুখ করো আগে, তারপর শুনো। আগে শুন্‌লে মিষ্টি মুখে দিতে তোমার ইচ্ছে হবে না। চা খাও ত' ?

আগে খেতাম না; ও বাড়ীতে এসে এখন অভ্যাস হয়েছে।

কিন্তু কথাটা কি! শুনিলে আহারে অরুচি জন্মিবে, এমন কি-কথা ওঁর থাকিতে পারে। অমঙ্গলের ভয়ে নন্দকিশোরের বুকে একটু কাঁপুনি দেখা দিল...

—বস একটু। একা থাক্‌তে সংকোচ ক'রো না। আমি শীগ্‌গিরই আস্‌ছি। বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

তারপর এক মিনিটও যায় নাই—নন্দকিশোর শুনিল, তার পিছন্ দিক্‌কার দরজা হইতে কে বলিতেছে: "মাষ্টার মশায়, দেখুন, কে এসেছে"।

শিশুসুলভ সুকোমল নির্ম্মল কণ্ঠস্বর—কোনো শিশু যেন লুকাইয়া থাকিয়া আনন্দভরে তাহাকে কৌতুক-ক্রীড়ায় আহ্বান করিতেছে !...কিন্তু তা' নয়—

সুকোমল নির্ম্মল কণ্ঠস্বর কানে যাইয়া নন্দকিশোর মনের কোণে একটু হাসি হাসি ভাব লইয়া চোখ ফিরাইতেই বিদ্যুতের ঝলক্ লাগিয়া তার চোখ মূহূর্ত্তের জন্য যেন দৃষ্টিহীন হইয়া গেল...

তাহারই বাঞ্ছিতা—সে-ই রূপ—যে-রূপ সম্মুখে আসিলে চক্ষু রূপ দেখিতে দেখিতে রূপদেখা বিস্মৃত হইয়া রূপের দিকেই নিষ্পলক হইয়া থাকিতে চায় ।...নন্দকিশোরের চক্ষু যত অল্প সময়ের জন্যই হোক, নিষ্পলক ত' হইলই, তার উপর এমন কিছু বিপর্য্যয় ঘটিল, যা' যন্ত্রণা ভোগ করিতে অনিচ্ছুক মানুষের অদৃষ্টে যত কম ঘটে ততই ভালো ; তার নাসিকা ও কর্ণযুগল সমেত সমগ্র মুখমণ্ডল লাল হইয়া আগুন ছুটিতে, আর, জ্বালা করিতে লাগিল—ত্বকের নিম্নভাগ রক্তপ্রবাহে ফাটফাট করিতে লাগিল, হৃদপিণ্ডের অবস্থা যা' হইল তা' অবর্ণনীয়—শরীরের সমুদয় রক্ত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছুটিয়া যাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল তাহাতেই...

দেহাভ্যন্তরের ঐ ক্ষিপ্ত উদ্দাম অবস্থাকেই সহ্য করিতে করিতে একরকম অচেতন অবস্থাতেই নন্দকিশোর তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে নতচক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইল ; কিন্তু নন্দকিশোরের ওঠা তাঁর মনঃপূত হইল না—হাসিয়া হাসিয়া আপত্তি প্রকাশ

করিলেন; বলিলেন, উঠে দাঁড়ালেন যে হঠাৎ? পালাবেন নাকি?

নন্দকিশোর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল—চেয়ারের গদি এবার চার ইঞ্চিরও বেশি বসিয়া গেল; নন্দকিশোর তা' টেরও পাইল না।

হ্যাঁ, বসুন। বলিয়া তিনি অদূরবর্ত্তী একখানা চেয়ারে যাইয়া বসিলেন; ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, একবার পালিয়ে যে শাস্তি দিয়েছেন আমাকে।

নন্দকিশোরের সংকট হইল বেজায়। যে রূপ নিষ্কম্প-প্রাণে প্রাণ ভরিয়া এবং নিষ্কম্প চক্ষে চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করিবার লালসায় সে মাকে প্রণাম না করিয়া এবং মমতার কাছে বিদায় লইতে বিস্মৃত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে মণীন্দ্রবাবুর গৃহে আসিয়া উঠিয়াছিল সে-রূপ এখন সম্মুখে বিরাজিত—

কল্পনার অঙ্কুশতাড়না চলিয়াছিল তখন—এখনও একটা অঙ্কুশতাড়না চলিতে লাগিল তার মনে, কিন্তু নন্দ চোখ তুলিতে পারিল না—তার সমস্ত উদ্যম আর অভীপ্সা যেন স্পষ্ট সত্য জাগ্রত জগতে নিস্তেজ হইয়া গেছে...

উঁহার অভিযোগ শুনিয়া নন্দকিশোরের আনত দৃষ্টি আরো ম্লান হইয়া গেল...

উনি বলিতে লাগিলেন, বাবু আমাকেই সন্দেহ করে কত যে সাবধান হয়েছেন তা' ত' দেখেইছেন। বাবুর ঘটে বুদ্ধি বড় কম।...আপনি যদি আমার দিকে চোখ তুলে না তাকান্

তবে আমি কথা বল্‌ব' না। চোখ তুলুন—হুকুম শুনুন্।

নন্দকিশোর নিষ্কম্প চক্ষু তুলিয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিল—দৃষ্টি নিবিষ্ট হইয়া রহিল—সত্যই প্রাণ জ্যোৎস্নার অমৃতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল...

—তাকিয়ে থাকুন, আমি কথা বলি। বাবু বলেন, "তুমি যখন কথা বলো তখন তোমাকে আরো সুন্দর দেখায়—এত সুন্দর যে স্থির থাক্‌তে পারিনে।" আপনারও কি সেই মত! স্থির থাকা কঠিন ?

নন্দকিশোরের মুখ ফুটিল ; বলিল, হ্যাঁ।

—কিন্তু অস্থির হ'লে ত' চলে না।...বল্‌ছিলাম বাবুর কথা। আমাকে না ধম্‌কে তাড়ানো উচিত ছিল আপনাকে আপনি যখন ফিরে এলেন। আমার লোভেই ফিরে' এসেছিলেন, নয় ? বলিয়া মুখ টিপিয়া আসিলেন—এম্‌নি ভঙ্গীতে সে-হাসি ফ্‌টিল যে, নন্দকিশোর ভয় পাইয়া গেল, সেই হাসির আকর্ষণ ছিন্ন করিতেই হঠাৎ চোখের পাতায় পাতায় মিলাইয়া তাহাকে যেন সে তার জীবনের বাহিরে একটা অন্ধকারে রাখিয়া দিল—নিজেকে তার বিশ্বাস নাই।

তবু নন্দকিশোরের মুখ পুনরায় ফ্‌টিল ; বলিল, হাঁ—

অর্থাৎ সত্যই তাঁহারই লোভে সে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

—কিন্তু বাবু তা' মোটেই বুঝ্‌তে পারেন নি ; তিনি কেবল পাহারা বসাতে আর তালা লাগাতেই ব্যস্ত।—বলিয়া তিনি অতি মনোহর অনুচ্চ একটু হাসির লহরী তুলিলেন—উঠিয়া

যাইয়া পালঙ্কে বসিলেন তাকিয়া টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িলেন

নন্দকিশোর তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল ; আর দেখিল যে, তাঁর দেহ অলস, বাহুযুগল স্কন্ধ পর্য্যন্ত অনাবৃত, অত্যন্ত শিথিল, আর, অত্যন্ত সুগঠিত, শয়নভঙ্গী স্বচ্ছন্দ···

মদিরচক্ষে দৃষ্টি হানিয়া তিনি বলিলেন,—আগের দিনে ছিল ভালো ; মুনি ঋষিরা বনে জঙ্গলে বাস করতেন, আর দরকার করলে কুয়াশা কি অন্ধকার সৃষ্টি করে নিতে পারতেন। তা-ই না ?

নন্দকিশোর বলিল, পারতেন।

—আপনি যদি তা' পারতেন তবে এখন কি সৃষ্টি করতেন কুয়াশা না অন্ধকার ?—বলিয়া তিনি এবার খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিলেন।

নন্দকিশোরের মুখমণ্ডল অসহ্য রক্তের চাপে যেন টাটাইয়া উঠিল।

—উঠি। আপনাকে সাম্‌নে করে শুয়ে আছি দেখলে মা আবার ভাববে বেয়াদবি কর্‌ছি।

—কৃষ্ণা ?—ভৎর্সনায় কঠিন হইয়া অতি নিকটেই সেই মায়েরই কণ্ঠ ধ্বনিত হইল।

নন্দকিশোর এতদিন পরে জানিতে পারিল, মেয়েটির নাম কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা অস্থির ভাবে উঠিয়া বসিল, কিন্তু ভৎর্সনায় লজ্জিত হইয়া কি ভয় পাইয়া নয়, হাসিতে হাসিতে পালঙ্কের ধার হইতে

পা ঝুলাইয়া দিয়া ছেলেমানুষের মত মনের সুখে পা দুলাইতে লাগিল...

মুহ্যমান্ অবস্থায় চোখ নামাইয়া নন্দকিশোর বসিয়াছিল —দোদুল্যমান পদপল্লব দু'টি তার চোখে পড়িল—দু'টি লীলায়িত অপরূপ শ্বেতপদ্ম যেন এই পায়েই সে স্বপ্নে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিল!

"শয়তান মেয়ে, তোমাকে এ ঘরে আস্‌তে আমি বারণ করিনি?"—বলিতে বলিতে কৃষ্ণার মা একহাতে খাবারের থালা এবং অপর হাতে চা লইয়া, নন্দকিশোরের সম্মুখে আসিলেন। তাঁর মন যে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তাঁর মুখ চোখ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল; খাদ্য এবং পানীয় তিনি ধীরে ধীরে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিলেন; বলিলেন,—বাবা এস, একটু মিষ্টিমুখ করো; আমার ইচ্ছা পূর্ণ করো, অনুরোধ রাখো।

কোথায় যেন একটা অথই পাথারে নিমজ্জিত দিশেহারা নন্দকিশোর মূহুর্ত্ত দুই নিজেকে, অর্থাৎ নিজের কোনো অংশকেই সঞ্চালিত করিতে পারিল না; তারপর বলিল,—দিন্।

কৃষ্ণা হঠাৎ নামিয়া দাঁড়াইল—

কৃষ্ণার মা কঠোর কণ্ঠে বলিলেন,—যাও। যাও এখান থেকে।

কিন্তু কৃষ্ণা মায়ের আদেশ ভ্রূক্ষেপও করিল না; চমৎকার আনন্দের সঙ্গে নন্দকিশোরের ডান হাতখানা দুই করতলের

ভিতর তুলিয়া লইয়া অসীম আগ্রহের সঙ্গে সে বলিল, আমাকে ক্ষমা করতে হবে। আপনার এই তরুণ বয়েস। আপনাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু তা' জানাবার সুযোগ কই !...বলিয়া নন্দকিশোরের হাত নন্দকিশোরের দিকেই ছুঁড়িয়া দিয়া সে চলিয়া গেল—দরজার কাছে যাইয়া বলিল —এখানে মা, ওখানে মণিবাবু !

তারপর আর কৃষ্ণাকে দেখা গেল না।

মণীন্দ্রের মুখে শোনা গল্প নন্দকিশোরের সমক্ষে স্বচ্ছ চাক্ষুষ বৃত্তান্তে দাঁড়াইয়া গেল ; কৃষ্ণা যার মারফৎ মণীন্দ্রের খুড়তুতো ভগিনী তিনিই ইনি—কৃষ্ণার গর্ভধারিণী। অতর্কিতে তার ইহাও মনে পড়িল যে, সে বেশ্যালয়ে বসিয়া আছে···

নন্দকিশোর ধীরে ধীরে খাবারে হাত দিল, খাবার মুখেও তুলিল···

কৃষ্ণার মা বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণার মা বটে, কিন্তু কৃষ্ণার আচরণে তাকে আমি প্রাণের ভেতর থেকে মেয়ে বলে স্বীকার করতে পারিনে, বড় বাধে। সে লোক ভালো নয়।...তোমাকে দেখে' অবধি তোমার ওপর কি যে একটা মায়া পড়েছে তা' বল্‌তে পারিনে। তোমার মুখখানা নেহাত ছোটছেলের মতো কাঁচা আর সরল। আমি মণির বাড়ীতে গিয়ে তোমাকে সেখানে দেখেই ভারি ভয় খেয়ে গেলাম। আমার মেয়ে কৃষ্ণা ঐ বাড়ীতেই থাকে, আমার ভয়ের কারণ হ'ল তা'ই। তোমাকে বল্‌ব' কি বাবা, মেয়েটা চিরকাল

শয়তান। মণির বাড়ীতে যাবার আগে সে অবশ্য এখানে আমার কাছেই থাকৃত'...

তা' হবে না—খাবার সবগুলো তোমাকে খেতে হবে; মাথার দিব্যি আমার।"

নন্দকিশোর খাবার খাওয়া বন্ধ করিয়া চায়ের দিকে হাত বাড়াইতেছিল—'মাথার দিব্যি' শুনিয়া সে-হাত ফিরাইয়া আনিয়া নিম্‌কি একখানা তুলিয়া লইল…

কৃষ্ণার মা বলিতে লাগিলেন'—"ওকে আয়ত্তে রাখ্‌তে গিয়ে কত যে নাস্তানাবুদ হয়েছি তা' বল্‌বার নয়। ভারি নিষ্ঠুরের মত স্বভাব ওর। রূপ আছে—রূপের জোরে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে মজা দেখা ওর মজ্জাগত অভ্যাস। কতজনকে যে মিছি মিছি পাগল করেছে তার ইয়ত্তা নাই। মনে হয়' কাউকে ভালবাসে না, বাস্‌তে পারেই না, ঈশ্বর ও-কে সে ক্ষমতা দেন নাই। তোমাকে মণির বাড়ীতে দেখে আমার তৎক্ষণাৎ মনে হল, আর, ভারি ভয় হ'ল যে এই ভালো ছেলেটাকে বজ্জাত মেয়ে আমার কষ্ট না দিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। কষ্ট যে তুমি পাচ্ছ তোমার ধরণ দেখে' তা'-ও কতকটা আঁচ করতে পারলাম। তোমাকে সাবধান করতেই তোমায় ডেকেছিলাম। কিন্তু দৈব তোমার বিপক্ষে বলেই মেয়ে এসে হাজির হয়েছে—তুমি আসার কিছু আগেই তোমার যন্ত্রণার কারণ যা ও হয়েছে তা' বল্‌বার নয়। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো, এর পর আর তুমি যন্ত্রণা পাবে না, তোমার মন ফিরে গেছে—তুমি বুঝেছ সব…

...মণির ছেলেকে পড়াতে থাকো, আর তোমার ভয় নেই দুঃখও থাকবে না—

"কেমন করেছি চা-টা"?

নন্দকিশোর বলিল, ভালই লাগছে।

—"আমাদের পরিচয় যে তুমি জানো তা' আমি জানি। তুমি ও-বাড়ী থেকে পালালে মণীন্দ্র যা সন্দেহ করেছিলেন তা' ঠিক্‌ই। তিনি কৃষ্ণাকে ধম্‌কে বলেছিলেন, সে-ভদ্রলোক যদি আসে তবে তাকে আমি বল্‌বই তুমি কে এবং কি তাহলে' আর তাকে নাচাবার আর কাঁদবার সুবিধা হবে না। সে লোকটা প্রকৃত সৎলোক—পরিচয় শুন্‌লে ঘেন্নায় সে মুখ দেখতে চাইবে না' কিন্তু..."

তিনি চুপ করিতেই নন্দকিশোর আবার তাঁর মুখের দিকে তাকাইল তিনি বলিলেন—"কিন্তু তুমি তা' পারো নাই। পার কঠিনই। কৃষ্ণাকে বিশ্বাস করে' তুমি কষ্টই পেয়েছ।

চা পান শেষ করিয়া নন্দকিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল বলিল— আমি এখন যাই।

—আচ্ছা, এস। চেনাশোনা হয়ে গেল, এস মাঝে মাঝে। আমাকে ঘেন্না করো না ত' ?

না। আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন, শৃঙ্খলমুক্ত করে নবজীবন দান করেছেন, সুখী করেছেন।...ঘেন্নার ভাব মনে রাখলে আমার চরম অকৃতজ্ঞতার পাপ হবে।—বলিয়া নন্দ-কিশোর দরজার দিকে অগ্রসর হইল...

তখন তার প্রাণে একমাত্র সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহারই মমতা ; মমতার মুখচ্ছবি অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া আছে—তার কণ্ঠ জিহ্বা হৃদয় ব্যাপিয়া নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতেছে মমতারই স্নিগ্ধ নামটি।

মারে, মারে শোন নীচে, বাঁচে মা
পীরবে মা শোনাচ্ছিস না তাও আমি
সেখানে।

মারে মা চলে যা চলে যা

সমাপ্ত